অদ্ভুতুড়ে সিরিজ
ঝিলের ধারে বাড়ি
শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

ঝিলের ধারে বাড়ি

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ: সুব্রত চৌধুরী

“রা-স্বা”
শ্রীতানাজী সেনগুপ্ত
করকমলেষু

এই লেখকের অন্যান্য বই

অঘোরগঞ্জের ঘোরালো ব্যাপার
অষ্টপুরের বৃত্তান্ত
উঁহু
কিশোর উপন্যাস সমগ্র (১-৪)
কুঞ্জপুকুরের কাণ্ড
গজাননের কৌটো
গোঁসাই বাগানের ভূত
গোলমেলে লোক
গৌরের কবচ
চক্রপুরের চক্করে
ছায়াময়
ঝিকরগাছায় ঝঞ্ঝাট
ডাকাতের ভাইপো
দশটি কিশোর উপন্যাস
দুধসায়রের দ্বীপ
নবাবগঞ্জের আগন্তুক
নবীগঞ্জের দৈত্য
নৃসিংহ রহস্য
পটাশগড়ের জঙ্গলে
পাগলা-সাহেবের কবর
পাতালঘর
বক্সার রতন
বটুকবুড়োর চশমা
বনি
বিপিনবাবুর বিপদ
ভুতুড়ে ঘড়ি
ভোলু যখন রাজা হল
মদন তপাদারের বাক্স
মনোজদের অদ্ভুত বাড়ি
মোহনরায়ের বাঁশি
রহস্য সমগ্র
রাঘববাবুর বাড়ি
যোলো নম্বর ফটিক ঘোষ
সর্বনেশে ভুল অঙ্ক
সাধুবাবার লাঠি
সোনার মেডেল
হিরের আংটি
হেতমগড়ের গুপ্তধন

সদাশিববাবু সকাল বেলায় তাঁর পুব দিকের বারান্দায় শীতের রোদে বসে পাঁচ রকম তেতো পাতার এক কাপ রস আস্তে আস্তে তারিয়ে-তারিয়ে খাচ্ছিলেন। এ-হল পঞ্চতিক্ত। ভারী উপকারী। সামনে বেতের টেবিলে গত কালকের তিনখানা খবরের কাগজ, একখানা পঞ্জিকা, ডায়েরি আর কলম। আজ বন্দুক পরিষ্কার করার দিন। তাই বচন পাশে আর-একটা কাঠের টেবিলে তিনখানা ভারী বন্দুক, বন্দুকের তেল, শিক, ন্যাকড়া সব সাজিয়ে রেখে গেছে । রসটা শেষ করেই সদাশিববাবু খবরের কাগজে চোখ বোলাবেন। তার পর পঞ্জিকা খুলে আজকের তিথিনক্ষত্র ভাল করে ঝালিয়ে নেবেন। ডায়েরিতে কাল রাতে যা লিখেছেন, তার ওপর একটু সংশোধন করবেন। তার পর বন্দুক পরিষ্কার করতে বসবেন। এক-এক দিন এক-এক রকম কাজ থাকে। কোনও দিন বন্দুক পরিষ্কার করা, কোনও দিন এগারোটা দেওয়ালঘড়িতে দম দেওয়া, কোনও দিন পুরনো জিনিসপত্র রোদে বের করে ঝাড়পোঁছ করা, কোনও দিন চিঠি লেখা ইত্যাদি।

চার দিকে প্রায় কুড়ি বিঘে জমি আর বাগান দিয়ে ঘেরা সদাশিববাবুর বাড়িটা খুবই বিশাল। এ বাড়িতে যে কতগুলো ঘর আছে, তার হিসেব সদাশিববাবুরও ভাল জানা নেই। শোনা যায়, তাঁর পূর্বপুরুষেরা ডাকাত ছিলেন। ডাকাতি করে ধনসঞ্চয়ের পর জমিদারি কিনে ব্রিটিশ আমলে 'রাজা' উপাধি পেয়েছিলেন। এ-বাড়িতে আগে কালীপুজোয় নরবলি দেওয়া হত। সদাশিববাবুর পূর্বপুরুষদের মধ্যে কেউ-কেউ তান্ত্রিক ছিলেন, এবং একজন শবসাধনায় সিদ্ধিলাভ করে অনেক অলৌকিক কাণ্ডকারখানাও করতেন । কুলপঞ্জিকায় এ সব ঘটনার কিছু-কিছু হদিস সদাশিববাবু পেয়েছেন। তবে এখন সবই ইতিহাস।

সদাশিববাবুর একটি মাত্র ছেলে। সেই ছেলে কলকাতায় বেশ বড় চাকরি করে। নাম রামশিব। রামশিবের এক ছেলে আর এক মেয়ে। মেয়ে অনন্যার বয়স বছর পনেরো, ছেলে বিল্বশিবের বছর-দশেক বয়স । দু'জনেই কলকাতার নামজাদা ইংরেজি স্কুলে পড়ে। তারা দাদুর বেজায় ভক্ত এবং বেজায় বন্ধুও। সপ্তাহে শনি-রবিবার এসে দাদুর কাছে থেকে যায়। অনেক সময়ে রামশিব নিজেই মোটর চালিয়ে নিয়ে আসে, নয়তো ড্রাইভার ভুজঙ্গই আনে। সারা সপ্তাহ সদাশিব নাতি আর নাতনির জন্য অপেক্ষা করেন।

সদাশিবের স্ত্রী এখনও বেশ শক্তপোক্ত আছেন সদাশিবের মতোই। সারা দিনই নানা রকম কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। এই রাঁধছেন, এই ডালের বড়ি দিচ্ছেন, এই নাড়ু পাকাচ্ছেন, এই আচার বানাচ্ছেন। সপ্তাহান্তে নাতি-নাতনি এসে খাবে বলে হরেক রকম খাবার বানিয়ে রাখেন। সদাশিব তাঁর টিকিরও নাগাল পান না সারা দিন।

তবে সদাশিবের আছে বচন মণ্ডল। সব কাজের কাজী।

সেই বচন মণ্ডলই হঠাৎ এসে উদয় হল। এবার খুব সাঙ্ঘাতিক রকমের শীত পড়েছে বলে সদাশিববাবুর পুরনো কাশ্মিরি একখানা ফুল-হাতা সোয়েটার বচনকে দেওয়া হয়েছে। বচন সাইজে সদাশিবের অর্ধেক। সেই

ঢলঢলে সোয়েটার হাতাটাতা গুটিয়ে পরে, মাথায় একখানা মিলিটারি টুপি চাপিয়ে যা একখানা সং সেজেছে, তাতে দিনে-দুপুরে দেখলেও লোকে আঁতকে ওঠে। বচন মণ্ডল বয়সে ছোকরা, তবে হাবভাব বিচক্ষণ বৃদ্ধদের মতোই। মুখে বড়-একটা হাসি নেই। বরং দুশ্চিন্তার ছাপ আছে।

বচন উদয় হয়ে বলল, "আজ্ঞে, তিনজন বাবু দেখা করতে এয়েছেন।"

শীতের সকালে এই সবে সওয়া ছ'টা, এর মধ্যে কারা এল?

সদাশিব জিজ্ঞেস করলেন, "কারা রে?"

"এখানকার লোক নয়। বাইরের। মোটরগাড়ি নে এয়েছেন। পেল্লায় মোটর। ঢুকতে দিইনি বলে আগ করেছেন খুব।"

"ঢুকতে দিসনি কেন?"

"সঙ্গে যে পেল্লায় এক রাগী কুকুর। বাগানে খরগোশ ছাড়া আছে, বেড়ালছানারা বাইরে রোদ পোয়াচ্ছে, রহিম শেখের মুরগিরা দানা খাচ্ছে, হরিণ চরছে, আমাদের তিনঠেঙে ভুলুও আছে। কাকে কামড়ায় কে জানে!"

সদাশিববাবু ভ্রূ কুঁচকে বললেন, "অ। তা বাবুরা সাত-সকালে কুকুর নিয়ে এলেন কেন? তা যাক গে, কী চায় জিজ্ঞেস করেছিস?"

"করেছি। তবে তাঁরা জবাব দিতে চাইছেন না। কটমট করে তাকাচ্ছেন।"

"বটে! মতলবখানা কী?"

"খারাপও হতে পারে, ভালও হতে পারে।"

"তা বাবুদের বল্ গে, কুকুর গাড়িতে রেখে এবং গাড়ি বাইরে রেখে পায়ে হেঁটে আসতে।"

"তাই বলি গে।"

বচন চলে গেল। সদাশিববাবু ভ্রূ কুঁচকেই রইলেন। এই জায়গা হল কেটেরহাট, যাকে বলে ধাধ্ধাড়া গোবিন্দপুর। কাছেই বাংলাদেশের সীমানা। এ রকম জায়গায় বাবুভায়েরা বড় একটা আসেন না। এঁরা কারা এলেন তবে?

পঞ্চতিক্তের গেলাসখানা খালি করে রেখে দিলেন সদাশিববাবু। তার পর খবরের কাগজ তুলে নিলেন। এখান থেকে ফটক অবধি অনেকখানি পথ। বাবুভায়েদের হেঁটে আসতে সময় লাগবে।

বেশ কিছুক্ষণ বাদে হঠাৎ তিনঠেঙে ভুলুর চ্যাঁচানিতে সদাশিববাবু বুঝলেন, বাবুভায়েরা আসছেন। ভুলুর মাত্র তিনটে ঠ্যাং হলে কী হয়, গলায় দশটা কুকুরের জোর। তিন ঠ্যাঙে নেচে নেচে সে যে-কোনও আগন্তুককেই বকাঝকা করতে ছাড়ে না।

সদাশিববাবু খবরের কাগজখানা নামিয়ে রাখলেন।

সামনে অনেকটা ঘাসজমি, তার পর সবজির বিস্তৃত বাগান, তার ধারে-ধারে নারকোল, পাম আর ইউক্যালিপ্টাস গাছের সারি। মোরামের পথ ধরে গাছপালার ফাঁক দিয়ে জনা-তিনেক কোটপ্যান্ট-পরা লোককে আসতে দেখা গেল, তাদের আগে-আগে বচন আর ভুলু।

বচন আগে-আগে বারান্দায় উঠে এসে বলল, "এই যে এঁরা..."

যে তিনজন লোক সামনে এসে দাঁড়াল, তাদের তিনজনের বয়সই ত্রিশের কাছে-পিঠে। বেশ শক্ত-সমর্থ চেহারা। একজনের গায়ে কালো চামড়ার একটা জ্যাকেট, একজনের গায়ে গাঢ় হলুদ পুল-ওভার, তৃতীয়জনের

পরনে নেভি ব্লু স্যুট।

তৃতীয়জনকেই নজরে পড়ে বেশি। বেশ লম্বা, সুঠাম চেহারা, মুখে বুদ্ধির ধার এবং ব্যক্তিত্বের ছাপ আছে। কোনও হেঁ হেঁ-ভাব নেই। মনে হচ্ছিল, এ-ই পালের গোদা।

প্রথম কথাও সে-ই বলল, "নমস্কার। আমরা একটা বিশেষ প্রয়োজনে আপনার কাছে এসেছি।"

সদাশিববাবু বিনয়ী লোক পছন্দ করেন। এ-লোকটার গলায় অবশ্য বিনয় নেই, স্পর্ধাও নেই। কাজের লোক।

সদাশিববাবু বললেন, "বসুন।"

তিনজন তিনখানা বেতের চেয়ারে বসল। সদাশিববাবু খুব কূটচক্ষে তাদের ভাবভঙ্গি লক্ষ করছিলেন। না, কোনও জড়তা নেই, কাঁচামাচু ভাব নেই, বিগলিত ভঙ্গি নেই। পা ছড়িয়ে দিব্যি আরামের ভঙ্গিতেই বসল।

লিডার লোকটা বলল, "যা বলছিলাম..."

সদাশিববাবু ভ্রূ কুঁচকে বন্দুকের আওয়াজে বললেন, "নাম?"

"ওঃ, হ্যাঁ," বলে লোকটা একটু হাসল, "আমার নাম অভিজিৎ আচার্য। আমি একজন সায়েন্টিস্ট। আর এঁরা হলেন..."

সদাশিববাবু আবার বন্দুকের আওয়াজ ছাড়লেন। "সায়েন্স মানে কী? ফিজিক্স না কেমিষ্ট্রি? না..."

অভিজিৎ চমকাল না। মৃদুস্বরে বলল, "সে-প্রসঙ্গ অপ্রয়োজনীয়। তবু বলছি, আমার বিষয় হল, এনটেমোলজি। পোকা-মাকড় নিয়ে..."

সদাশিববাবু মাথা নেড়ে বললেন, "জানি। আর এঁরা?"

"এঁরা আমার সহকর্মী। সুহাস দাস আর সুদর্শন বসু।"

"এবার প্রয়োজনটার কথা বলুন।"

অভিজিৎ দুই সঙ্গীর দিকে এক পলক তাকিয়ে নিয়ে সদাশিববাবুর দিকে চেয়ে বলল, "বড় ঝিলের ধারে আপনার একটা বাড়ি আছে। সেই বাড়িটা আমরা কিছু দিনের জন্য ভাড়া নিতে চাই।"

সদাশিববাবু খুবই অবাক হলেন। বললেন, "ঝিলের ধারের বাড়ি ভাড়া নেবেন? বলেন কী?"

"আমরা একটু রিসার্চ করতে চাই। একটা ভাল স্পট বহুদিন ধরে খুঁজে বেড়াচ্ছি। এ-রকম স্যুটেবল স্পট আর দেখিনি।"

সদাশিববাবুর টাকার অভাব নেই। পৈতৃক সম্পত্তির সূত্রে তাঁর জমানো টাকা বিস্তর। বিষয়-সম্পত্তিও বড় কম নেই। তিনি জীবনে বাড়িতে ভাড়াটে বসাননি। সুতরাং মাথা নেড়ে বললেন, "ভাড়া-টাড়া আমি কাউকে দিই না। ও-সব হবে না। তবে রিসার্চের কাজ হলে দু'-চার দিন আপনারা এমনিতেই এসে থাকতে পারেন।"

অভিজিৎ চেয়ারটা একটু সামনে টেনে আনল, তার পর বলল, "রিসার্চের কাজ এক-দু' দিনে তো কিছুই হয় না। মাসের পর মাস লেগে যায়। আরও একটা কথা হল, কাজটা একটু অ্যাডভান্সড স্টেজের এবং খুবই গোপনীয়। সেই জন্যই আমরা এ-রকম একটা রিমোট জায়গা খুঁজে বের করেছি। এ-কাজে একটা খুব বড় সংস্থা আমাদের টাকা দিচ্ছে। ভাড়াও তারাই দেবে।"

সদাশিববাবু একদৃষ্টে লোকটার দিকে চেয়েছিলেন। বললেন, "কাজটা অ্যাডভান্সড স্টেজের এবং গোপনীয় বলছেন? কী রকম কাজ, তা বলতে বাধা আছে?"

অভিজিৎ একটু ভাবল। তার পর বলল, “শুধু বাধা নয়, বিপদও আছে।”

সদাশিববাবুর ভ্রূ ওপরে উঠে গেল। তিনি তীক্ষ্ণ চোখে আগন্তুককে লক্ষ করে বললেন, “বিপদ! রিসার্চ ওয়ার্কে আবার বিপদ কিসের?”

অভিজিৎ নিজের দুই সঙ্গীর সঙ্গে একটা গোপন অর্থপূর্ণ দৃষ্টি বিনিময় করে নিয়ে বলল, "সব কথা খুলে বলতে পারছি না বলে আমাকে মাফ করবেন। কিন্তু এটুকু বলতে পারি, আমাদের কাজে যদি আমরা সফল হই, তবে দেশের উপকার হবে।"

সদাশিববাবু একটু হাসলেন। তার পর বললেন, "আমার বয়স কত জানেন?"

"জানি। সাতাত্তর। আপনি ছ' ফুট এক ইঞ্চি লম্বা। ওজন বিরাশি কেজি। আপনি ইংরেজি অনার্স আর এম. এ.-তে ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছিলেন। এক সময়ে দুর্দান্ত স্পোর্টসম্যান ছিলেন। টেনিসে ছিলেন ইন্ডিয়া নাম্বার থ্রি। ফ্রি রাইফেল শুটিং-এ ছিলেন ন্যাশনাল চ্যাম্পিয়ন। ভাল ক্ল্যাসিক্যাল গান গাইতে পারতেন। শিকারি ছিলেন। আরও বলতে হবে কি?"

সদাশিব এত অবাক হয়ে গেলেন যে, কয়েক সেকেন্ড কথা এল না মুখে। তার পর সোজা হয়ে বসে বললেন, "দাঁড়াও, দাঁড়াও ছোকরা। তুমি তো ডেঞ্জারাস লোক হে! অ্যাঁ! এত খবর তোমাকে দিল কে?"

অভিজিৎ মৃদু মৃদু হাসছিল। বলল, "আপনার সম্পর্কে যা কিছু জানি, সেগুলো লোকের মুখে শোনা। আর লোকেরা শুনেছে আপনারই মুখে।"

"তার মানে?"

"সদাশিববাবু, বয়স হলে মানুষ তার অতীতের কথা লোককে বলতে ভালবাসে। আপনিও ব্যতিক্রম নন। এই কেটেরহাটের লোকেরা আপনার সেই স্মৃতিকথা শুনে-শুনে মুখস্থ করে ফেলেছে। আমরা আপনার বাড়িটার খোঁজে এসে আপনার সম্পর্কেও অনেক কথা তাদের মুখেই শুনেছি।"

সদাশিববাবু একটা স্বস্তির খাস ছেড়ে বললেন, "তাই বলো। আমি ভাবলাম বুঝি পেছনে গোয়েন্দা লাগিয়েছ।"

সদাশিববাবু নিজেও টের পাননি, কখন তিনি অভিজিৎকে 'আপনি' থেকে 'তুমি' বলে সম্বোধন করতে শুরু করেছেন।

অভিজিৎ মাথা নেড়ে বলল, "না, গোয়েন্দা লাগানোর তো কোনও প্রয়োজন নেই। কিন্তু বয়সের কথাটা কেন বলছিলেন তা বুঝতে পারিনি।"

সদাশিববাবু গম্ভীর হয়ে বললেন, "হুঁঃ। বয়সের কথাটা বলছিলাম তোমাদের লম্বা-চওড়া কথা শুনে। বাঙালিরা হচ্ছে ভেতো, গেঁতো আর তেতো। তাদের দিয়ে বড় কাজ হওয়ার কোনও আশাই আর নেই। তা, তোমরা এমন কী সাঙ্ঘাতিক কাজ করছ হে বাপু, যাতে দেশের উপকার হবে! আবার নাকি তাতে বিপদও আছে! আবার নাকি সেটা খুব টপ সিক্রেট!"

অভিজিতের মুখটা ম্লান হয়ে গেল। খানিকক্ষণ চুপ থেকে সে বলল, "কথাটা আপনি ভুল বলেননি। বাঙালিরা—ওই আপনি যা বললেন, তাই—ভেতো, গেঁতো আর তেতো। তবে আমার শিক্ষাটা হয়েছিল বিদেশে। সেখানে দিনের মধ্যে আঠেরো ঘণ্টা খাটতে হয়। তাই আমি পুরোপুরি বাঙালি হয়ে উঠতে পারিনি। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, আমার কাজটা কত-দূর সাঙ্ঘাতিক তা আমিও জানি না। এমনও হতে পারে যে, সব পরিশ্রমই পণ্ড হয়ে যাবে, কিছুই ঘটবে না। কিন্তু যে-কোনও সত্যানুসন্ধানীকে তো এ রকম হতাশার মুখোমুখি বার বারই হতে হয়।"

সদাশিববাবু ছোকরার কথাবার্তা শুনে অখুশি হলেন না। কথাগুলো খুব খারাপ তো বলছে না। তিনি নড়েচড়ে বসে বললেন, "তা বেশ। কাজ করার ইচ্ছে তো খুবই ভাল। বাঙালিরা কিছু করলে আমি খুশিই হই।"

"তা হলে বাড়িটা কি আমরা ভাড়া পাব?"

সদাশিববাবু একটু চিন্তা করলেন। তার পর বললেন, "ও-বাড়িতে বহুকাল কেউ থাকেনি, সংস্কারও কিছু হয়নি, বুড়ো দারোয়ান সিদ্ধিনাথই যা দেখাশোনা করে। তাকে অবশ্য মাইনে দিয়ে পুষতে হয়। আমি বলি কি, আমাকে ভাড়া দিতে হবে না, তোমরা যে ক' মাস থাকবে, সিদ্ধিনাথকে মাসে-মাসে চারশো টাকা করে দিয়ে দিও।"

অভিজিৎ মাথা নেড়ে বলল, "আমরা রাজি।"

"আর সাফসুতরো যা করবার, তাও তোমাদেরই করিয়ে নিতে হবে।"

অভিজিৎ খুব বিনীত ভাবে বলল, "যে আজ্ঞে। তবে আমরা বাড়িটাতে ইলেকট্রিক ফেন্স লাগাব, জেনারেটর বসাব, ঘরগুলোতে কিছু যন্ত্রপাতি বসাতে হবে। আপনার অনুমতি চাই।"

"ঠিক আছে। যা করার করো। আর ইয়ে, মাঝে-মাঝে এসে দেখা করে যেও। কেমন কাজকর্ম হচ্ছে ব'লো। কোনও অসুবিধে হলে তাও জানিও। আগেই বলছি, ও-বাড়িতে সাপখোপ থাকতে পারে। আর সিদ্ধিনাথ নাকি প্রায়ই ভূত দেখে।"

এবার তিনজনেই চাপা হাসি হাসল।

চা খেয়ে অতিথিরা বিদায় নিল।

সদাশিব বন্দুক পরিষ্কার করতে বসলেন। বসে ভাবতে লাগলেন, কাজটা ঠিক হল কি না।

ডাকাতে ঝিলের তিন পাশে যে নিবিড় জঙ্গল আর ভুসভুসে কাদা, তাতে জায়গাটা মানুষের পক্ষে প্রায় অগম্য। দিনের বেলাতেই জঙ্গলের মধ্যে অন্ধকার ঘনিয়ে থাকে। ঝিলের জলেও বিস্তর আগাছা আর কচুরিপানা জন্মেছে। বহু দিন এই দূষিত জল কেউ ব্যবহার করেনি। এমনকী, স্নান করতে বা মাছ ধরতেও কেউ আসে না।

ঝিলের দক্ষিণ ধারে একখানা পুরনো বড় বাড়ি। বাড়িটার জীর্ণ দশা বাইরে থেকে বোঝা যায়। সিদ্ধিনাথ দিন-রাত শুনতে পায়, বাড়িটার ভিতরে ঝুরঝুর করে চুন-বালি খসে পড়ছে। মেঝেয় গর্ত বানাচ্ছে ইঁদুর। আরশোলা, উইপোকা, ঘুণ, বিছে, তক্ষক, কী নেই এই বাড়িতে? আর যারা আছেন, তাঁদের কথা ভাবলেও গায়ে কাঁটা দেয়। রাতের বেলায় কত শব্দ হয় বাড়ির মধ্যে, কত খোনা গলার গান, হাসি শোনা যায়।

সিদ্ধিনাথ তখন আউট হাউসে নিজের ছোট ঘরখানায় কাঠ হয়ে থাকে। সিদ্ধিনাথ আগে রোজ ঝাড়পোঁছ করত। আজকাল হাল ছেড়ে দিয়েছে। সপ্তাহে এক দিন করে সে বাড়িটা ঝাড়পোঁছ করে বটে, কিন্তু বুঝতে পারে, নড়বড়ে বাড়িটার আয়ু আর বেশি দিন নয়। হঠাৎ ধসে পড়ে যাবে।

বাড়ির পিছন দিকে বাঁধানো ঘাটের সিঁড়ি নেমে গেছে ঝিলের জলে। সিঁড়ির অবস্থা অবশ্য খুবই করুণ। মস্ত-মস্ত ফাটল হাঁ করে আছে। তার মধ্যে কচ্ছপেরা ডিম পেড়ে যায়। ঢোঁড়া সাপ আস্তানা গাড়ে। পোকা-মাকড় বাসা বেঁধে থাকে। কোথাও কোথাও শান ফাটিয়ে উদ্ভিদ উঠেছে।

সিদ্ধিনাথই একমাত্র লোক, যে ঝিলের জল ব্যবহার করে। এই জলে সিদ্ধিনাথ কাপড় কাচে, বাসন মাজে, স্নান করে। তার অসুখ করে না। গত চল্লিশ বছর ধরে সদাশিববাবুর এই বাড়িখানায় পাহারাদারের চাকরি করছে সে। এই চল্লিশ বছর ধরে প্রায় প্রতি দিনই সে ঘাটের সিঁড়ি কত দূর নেমে গেছে, তা ডুব দিয়ে দেখার চেষ্টা করেছে। তার কারণ, কিংবদন্তী হল, এই সিঁড়ির শেষে, ঝিলের একেবারে তলায় কোনও গহিন রাজ্যে একখানা মন্দির আছে। সেখানে ভারী জাগ্রত এক দেবতা আছেন। যে একবার সেখানে পৌঁছতে পারবে, তার আর ভাবনা নেই। দুনিয়া জয় করে নেওয়া তার কাছে কিছুই নয়।

সিদ্ধিনাথ বহু দিনের চেষ্টায় এ-পর্যন্ত জলের তলায় ষাটটা সিঁড়ি অবধি যেতে পেরেছে। তারও তলায় সিঁড়ি আরও বহু দূর নেমে গেছে। কোনও মানুষের পক্ষে তত দূর নেমে যাওয়া সম্ভব নয়।

সিদ্ধিনাথ পারেনি বটে, কিন্তু আজও সে প্রায়ই ঘাটের পৈঠায় বসে জলের দিকে চেয়ে থাকে।

আজ সকালে ঘাটে বসে যখন আনমনে নানা কথা ভাবছিল, তখন হঠাৎ কেমন যেন মনে হল, কেউ আড়াল থেকে তার দিকে তাকিয়ে আছে।

সিদ্ধিনাথ চার দিকে তাকিয়ে দেখল। কোথাও কেউ নেই। দিব্যি রোদ উঠেছে। ঠাণ্ডা বাতাস হাড় কাঁপিয়ে বয়ে যাচ্ছে, পাখি ডাকছে। ঝিলের ও পাশে নিবিড় জঙ্গলে অন্ধকার জমে আছে।

সিদ্ধিনাথ গায়ের চাদরখানা আর-একটু আঁট করে জড়িয়ে বসল। কিছুক্ষণ পর আবার তার কেমন মনটা সুড়সুড় করে উঠল। তার দিকে কে যেন আড়াল থেকে তাকিয়ে আছে।

সিদ্ধিনাথ ভারী অস্বস্তিতে পড়ে গেল। এ রকম অনুভূতি তার বড় একটা হয়নি কোনও দিন। এই নির্জন জায়গায় কে আসবে, আর কারই বা দায় পড়েছে সিদ্ধিনাথের দিকে তাকিয়ে থাকার?

সিদ্ধিনাথ উঠে চার দিকের ঝোপঝাড় ঘুরে দেখল। হাতের লাঠিটা দিয়ে ঝোপঝাড় নেড়ে-চেড়ে দেখল। কেউ নেই।

সিদ্ধিনাথ আবার এসে পৈঠায় বসতে যেতেই ফটকের বাইরে একটা গাড়ির ভ্যাঁপোর ভোঁ শোনা গেল। বেশ ঘন-ঘন শব্দ হচ্ছে। কে যেন চেঁচাচ্ছে, "সিদ্ধিনাথ! ওহে সিদ্ধিনাথ!"

সিদ্ধিনাথ ভারী অবাক হল। কে আবার এল জ্বালাতে?

বাড়িটা ঘুরে সামনের দিকে বাগান পার হয়ে ফটকের কাছে এসে সিদ্ধিনাথ দেখল, জিপ গাড়ি দাঁড়িয়ে। কয়েকজন বাবু গেট ধরে ঝাঁকাঝাঁকি করছেন।

"কী চাই আপনাদের?"

"আপনিই কি সিদ্ধিনাথ?"

"হ্যাঁ, আপনারা কারা?"

“আমরা সদাশিববাবুর কাছ থেকে আসছি। এ-বাড়ি আমরা ভাড়া নিয়েছি।”

সিদ্ধিনাথ চোখ কপালে তুলে বলল, “ভাড়া নিয়েছেন? বাড়ি যে পড়া-পড়ো! শেষে কি বাড়ি-চাপা পড়ে মরার সাধ হল আপনাদের?”

অভিজিৎ বলল, “ফটকটা আগে খুলুন তো মশাই, বাড়িটা নিজের চোখে দেখতে দিন।”

লোকগুলোর চেহারা, পোশাক-আশাক বাবুদের মতো হলেও কেমন যেন মানুষগুলোকে বিশেষ পছন্দ হল না সিদ্ধিনাথের। কিন্তু সে হল হুকুমের চাকর। কোমরের কার-এ বাঁধা চাবি দিয়ে ফটকের তালা খুলে দিয়ে উদাস কণ্ঠে বলল, “দেখে নিন।”

আশ্চর্যের বিষয়, লোকগুলো বাড়িটা ঘুরে-ফিরে দেখে পছন্দ করে ফেলল। বলল, “বাঃ, দিব্যি বাড়ি।”

অভিজিৎ নামে লোকটি হঠাৎ ‘আপনি’ ছেড়ে ‘তুমি’তে নেমে সিদ্ধিনাথকে বলল, “তা, তুমি এখানে কত দিন আছ হে বাপু?”

“সে কি আর মনে আছে ভাল করে! তবে চল্লিশ বছর তো হবেই।”

“তা, তোমার দেশে-টেশে যেতে ইচ্ছে করে না?”

“দেশে যেতে?”

“হ্যাঁ হে। যাও না, দেশ থেকে কিছু দিন ঘুরে-টুরে এসো গিয়ে। আমরা নাহয় থোক কিছু টাকা দিচ্ছি তোমাকে।”

সিদ্ধিনাথ মাথা চুলকে বলল, “দেশ একটা ছিল বটে মশাই। এখান থেকে বিশ-মাইলটাক ভিতরে। বিশ বছর আগেও এক খুড়ি বেঁচে ছিল সেখানে। মাঝে-মাঝে যেতুম। বিশ বছর হল খুড়িমা মরে অবধি দেশের সঙ্গে সম্পর্ক ঘুচে গেছে।”

অভিজিৎ একটু হেসে বলল, “তা, দেশে না যাও, তীর্থ-টির্থও তো করতে যেতে পারো। এক জায়গায় এত দিন এক-নাগাড়ে থাকতে কি ভাল লাগে?”

সিদ্ধিনাথ এবার একটু ভেবে বলল, “সেটা একটা কথা বটে। এত কাছে কলকাতার কালীঘাট, সেটা অবধি দেখা হয়ে ওঠেনি।”

“কালীঘাট যাও, হরিদ্বার যাও, কাশী যাও। ঘুরে-টুরে এসো তো! এখন আমরা এসে গেছি, বাড়ি পাহারা দেওয়ার তো আর দরকার নেই।”

‘কথাটা মন্দ বলেননি। আচ্ছা, বাবুকে বলে দেখি।”

অভিজিৎ মোলায়েম গলায় বলল, “তার দরকার কী? মাইনে তো তোমাকে আমরাই দেব, সুতরাং আমরাই এখন তোমার বাবু। আমরা যখন তোমাকে ছুটি দিচ্ছি, তখন আর তোমার ভাবনা কী?”

সিদ্ধিনাথ মাথা নেড়ে বলল, “যে আজ্ঞে। তা আপনারা কবে বাড়ির দখল নিচ্ছেন?”

“আজই। আমাদের সঙ্গে কিছু জিনিসপত্র আর যন্ত্রপাতি আছে, সেগুলো এ-বেলাই চলে আসবে। তুমি একটু ঝাঁটপাট দিয়ে দাও ঘরগুলো।”

সিদ্ধিনাথ মিনমিন করে বলল, “বাড়ির অবস্থা কিন্তু ভাল নয় গো বাবুরা। কোন্ দিন যে হুড়মুড় করে পড়বে, তার কিছু ঠিক নেই কিন্তু।”

তার কথায় অবশ্য কেউ কান দিল না।

বাবুরা যে অন্য ধাঁচের, তা বুঝে নিতে বেশি সময় লাগল না সিদ্ধিনাথের। এরা সব শহর-গঞ্জের লোক, মেলা লেখা-পড়া করেছে, চটাস-পটাস করে ইংরেজি বলে। এরা নিশ্চয়ই ভূত-প্রেত মানে না, ভগবানকেও মানে কি না সন্দেহ। আর আশ্চর্যের ব্যাপার হল, ভূতেরাও কখনও ভুলেও এ সব বাবুদের কাছে ঘেঁষেন না, সুতরাং, এদের কাছে এ-বাড়ির ভূতের বৃত্তান্ত বলে লাভ নেই।

সিদ্ধিনাথ ঘর-দোর ভাল করে ঝাঁট-পাট দিয়ে ঝুল ঝেড়ে দিল।

বাগানটায় বড্ড জঙ্গল হয়েছে। আগে সিদ্ধিনাথ গাছ-টাছ লাগাত, আগাছা তুলে ফেলত। আজকাল আর পণ্ডশ্রম করতে ইচ্ছে যায় না। ফলে বাগানটা একেবারেই জংলা গাছে ভরে গেছে।

কোদাল কুড়ুল কাঁচি নিয়ে সিদ্ধিনাথ বাগানটা পরিষ্কার করতে উদ্যোগ করছিল। বাবুরা ধেয়ে এল হাঁ-হাঁ করে। অভিজিৎ বলল, “খবরদার, ও কাজও ক’রো না। আগাছার জন্যই বাড়িটা আমরা ভাড়া নিয়েছি।”

আগাছায় কার কী কাজ তা জানে না সিদ্ধিনাথ। তবে পরিশ্রম বেঁচে যাওয়ায় খুশিই হল সে। কিন্তু ভুতুড়ে জংলা বাড়ি ভাড়া নিয়ে শহুরে বাবুরা কী করতে চায়, তা তার মাথায় কিছুতেই সেঁধোল না। তাকে দেশে যেতে বলছে, তীর্থ করতে যাওয়ার পরামর্শ দিচ্ছে, এটাও তেমন সুবিধের ঠেকছে না সিদ্ধিনাথের। তাকে সরিয়ে দিতে চাইছে কি?

সদাশিব-কর্তার বুদ্ধি-বিবেচনার ওপর তেমন ভরসা নেই সিদ্ধিনাথের। নামে যেমন সদাশিব, কাজেও তেমনি বোম-ভোলানাথ। দুটো মন রাখা কথা বললেই একেবারে গলে জল হয়ে যান। তবু কর্তার কানে কথাটা তোলা দরকার। সিদ্ধিনাথ ফরসা ধুতি আর পিরান পরে, মাথায় একটা পাগড়ি বেঁধে লাঠিগাছ হাতে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল।

পথে শ্রীপতির মুদির দোকান। সিদ্ধিনাথ দোকানের বাইরে একখানা বেঞ্চে বসে প’ড়ে, পাগড়ির ন্যাজ দিয়ে মুখ মুছে বলল, “ওরে, শ্রীপতি, শুনেছিস বৃত্তান্ত?”

“না গো সিদ্ধিনাথদা। বৃত্তান্তটা কী?”

ঝিলের বাড়ি ভাড়া হল রে! একেবারে ফিটফাট সব বাবুরা এসে গেল।”

“বলো কী গো? তাই দেখছিলুম বটে একখানা ঢাকনা-খোলা জিপ গাড়ি হাঁকড়ে কারা সব যাতায়াত করছে।”

“তারাই। ও দিকে বাড়ি যে কখন মাথার ওপর ভেঙে পড়ে, তার ঠিক নেই।”

“তা, ওই ভূতের বাড়িতে কি তিষ্টোতে পারবে? তোমার মতো ডাকাবুকো লোক পারে বলে কি আর সবাই পারে? তে-রাত্তির কাটবার আগেই চোঁ-চাঁ দৌড় দিয়ে পালাবে।”

সিদ্ধিনাথ মুখখানা বিকৃত করে বলল, “ভূতের কথা আর বলিস না। তাদের আক্কেল দেখলে ঘেন্না হয়। এমনিতে তেনারা রোজ বাড়ির মধ্যে ভূতের নেত্য, ভূতের কেত্তন লাগাবেন, কিন্তু যখনই শহরের বাবুভায়েরা এল, অমনি সব নতুন বউয়ের মতো চুপ মেরে যান। এই তো কয়েক বছর আগে কলকাতা থেকে কর্তাবাবুর ছেলের বন্ধুরা সব বেড়াতে এল। বউ-বাচ্চা সব নিয়ে। বনভোজন করল, কানামাছি খেলল। দু’-তিন রাত্রি দিব্যি কাটিয়ে দিল। তা কই, তেনারা তো রা’ও কাড়েননি।”

শ্রীপতি একটু ভেবে বলল, “আসলে কি জানো সিদ্ধিনাথদা, গেঁয়ো ভূত তো, শহুরে লোককে ভয় দেখাতে ঠিক সাহস পায় না।”

সিদ্ধিনাথ উঠল, "যাই রে, কর্তাবাবুর কাছে যেতে হবে।"

বাজারের মুখে পীতাম্বরের দরজির দোকানেও খানিক বসল সিদ্ধিনাথ। গায়ের পিরানটার বোতাম নেই। সেটা খুলে দিয়ে বলল, "দুটো বোতাম বসিয়ে দে বাবা।...বৃত্তান্তটা শুনেছিস? ঝিলের বাড়িতে যে সব কলকাতার বাবুরা এসে গেল।"

পীতাম্বর বোতাম বসাতে বসাতে বলল, "বুঝবে ঠেলা।"

সিদ্ধিনাথ উদাস মুখে বলল, "মেলা টাকা। জিনিসপত্রও তো দেখছি পাহাড়প্রমাণ। কী মতলব কে জানে বাবা।"

পীতাম্বর দাঁতে সুতো কেটে বলল, "তোমার ঝিলের তলার সেই মন্দিরের হদিস পায়নি তো?"

সিদ্ধিনাথ একটু চমকে উঠে বলল, "ভাল কথা মনে করিয়ে দিয়েছিস তো! নাঃ, এ তো বেশ ভাবনার কথা হল।"

পীতাম্বর নিশ্চিন্ত গলায় বলল, "ভাববার কী আছে? তুমি চল্লিশ বছর ধরে চেষ্টা করে যার হদিস করতে পারোনি, বাবুরা কি আর হুট করে তার খোঁজ পাবে?"

"তা বটে। পাপী-তাপীদের কম্মও নয়। তবে কিনা এ হল ঘোর কলিকাল। উলট-পুরাণ যাকে বলে।"

পিরান গায়ে দিয়ে সিদ্ধিনাথ উঠে পড়ল।

পথে নবীনের বাড়ি। নবীন লোকটার জন্য সিদ্ধিনাথের ভারী দুঃখ হয়। সদাশিব কর্তার মতো নবীনের পূর্বপুরুষেরাও ডাকাত ছিল। শোনা যায়, তাদেরই দাপট ছিল বেশি। অবস্থা ছিল রাজা-জমিদারের মতোই। সেই নবীনের আজ টিকি অবধি মহাজনের কাছে বাঁধা।

অথচ নবীন লোকটা বড় ভাল। দোষের মধ্যে বেড়ানোর নেশা আছে, লোককে খাওয়াতে ভালবাসে, আর উদ্ভট জিনিস দেখলেই অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা না-করে কিনে ফেলে। এই সব করে করে হাতের টাকা সব চলে গেছে। বাড়িটা অবধি মহাজনের কাছে বিক্রি কবালায় বাঁধা।

থাকার মধ্যে নবীনের আছে এক বুড়ি পিসি আর এক পুরনো চাকর মহাদেব। প্রকাণ্ড দোতলা বাড়িটাতে তিনটে মোটে প্রাণী।

বয়সে নিতান্ত ছোকরা বলে সিদ্ধিনাথ নবীনকে নাম ধরেই ডাকে।

ফটকের কাছে দাঁড়িয়ে সিদ্ধিনাথ হাঁক দিল, "ও নবীন! বলি নবীন আছ নাকি হে?"

নবীন দোতলার বারান্দায় বসে বই পড়ছিল। মুখ বাড়িয়ে বলল, "কী ব্যাপার সিদ্ধিনাথ-খুড়ো।"

"আর ব্যাপারের কথা ব'লো না। বলি কেটেরহাট যে কলকাতা হয়ে গেল হে। ঝিলের ধারের বাড়িতে যে ভাড়াটে এসেছে, সে-খবর রাখো?"

"সে তো ভাল কথা খুড়ো। তুমি এত কাল একা ছিলে, এবার কথা বলার লোক হল।"

"হ্যাঁ, কথা বলতে তাদের বড় বয়েই গেছে। আমাকে তাড়াতে পারলে বাঁচে। এক বার বলছে 'দেশে যাও', আবার বলছে 'তীর্থ করে এসো গে'। মতলব বুঝে উঠতে পারছি না। পয়সা দিতে চাইছে।"

"দাঁওটা ছেড়ো না খুড়ো। এই বেলা ঘুরে-টুরে এসো গে।"

"ওরে বাপ রে, সে কি আর ভাবিনি? তবে কিনা কেটেরহাটের হাওয়া ছাড়া আমি যে হাঁফিয়ে উঠব বাপ।"

"তা বটে। তুমি হলে কেটেরহাট-মনুমেন্ট।"

"তোমার খবর-টবর কী? পাতাল-ঘরের দরজা খুলতে পারলে?"

নবীন হতাশভাবে মাথা নেড়ে বলল, "না খুড়ো। বিশ বছরের চেষ্টাতেও খুলল না। আমি হাল ছেড়ে দিয়েছি।"

সিদ্ধিনাথ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। নবীনের কপালটা সত্যিই খারাপ। বাড়ির তলায় একখানা পাতাল-ঘর আছে। কিন্তু মুশকিল হল, সেটার দরজা ভীষণ পুরু আর শক্ত, লোহার পাতে তৈরি। তাতে না আছে কোনও জোড়, না আছে চাবির ফুটো। কীভাবে সেই দরজা খুলবে, তা কে জানে। হাতুড়ি শাবল দিয়ে বিস্তর চেষ্টা করা হয়েছে, দরজায় আঁচড়ও বসেনি। দেওয়াল ফুটো করার চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু নিরেট পাথরের দেওয়াল টলেনি। কে জানে, হয়তো ওই পাতালঘরে গুপ্তধন থাকতেও পারে।

পাতালঘরের কথা মহাজন গোপীনাথ জানতে পেরে নবীনকে শাসিয়ে গেছে, "খবরদার, ও ঘরে হাত দেওয়া চলবে না। বাড়ি আমার কাছে বাঁধা, তার মানে বাড়ি এক রকম আমারই। এখন বাড়ির কোনও রকম চোট-টোট হলে কিন্তু জবাবদিহি করতে হবে।"

গোপীনাথ শুধু মহাজনই নয়, লেঠেলদেরও সর্দার। তার হাতে মেলা পোষা গুণ্ডা-বদমাশ আছে। কাজেই তাকে চটিয়ে দিলে সমূহ বিপদ। নবীন তাই ভারী নির্জীব হয়ে আছে, আজকাল।

"তোমার কপালটাই খারাপ হে, নবীন। পাতালঘরটা খুলতে পারলে বুঝি বরাত ফিরে যেত।"

নবীন একটা হতাশার ভঙ্গি করে বলল, "পাতালঘরের কথা বাদ দাও, খুড়ো, তোমার ঝিলের তলার মন্দিরের কী হল বলো।"

সিদ্ধিনাথ কপাল চাপড়ে বলল, "আমার কপালটাও তোমার মতোই খারাপ হে, নবীন।"

সিদ্ধিনাথ নবীনের কথাটা ভাবতে ভাবতে ফের এগোল। পথে আরও নানা চেনা লোক, চেনা দোকান, চেনা বাড়ি। সকলের সঙ্গে একটা-দুটো করে কথা বলতে বলতে যখন সদাশিবের বাড়ি গিয়ে হাজির হল, তখন প্রায় দুপুর, সদাশিব স্নানের আগে রোদে বসে তেল মাখছেন।

সিদ্ধিনাথ কাঁচুমাচু মুখ করে সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই সদাশিব মুখ তুলে চেয়ে বললেন, "এই যে নবাবপুত্তুর, এত দিনে দেখা করার সময় হল? বলি, সারা দিন কী রাজকার্য নিয়ে থাকা হয় শুনি? ঝিলের তলার মন্দির নিয়ে ভেবে ভেবে বাবুর বুঝি ঘুম হচ্ছে না?"

সিদ্ধিনাথ মাথা চুলকে বলল, "কর্তাবাবু, আপনার তো দয়ার শরীর, সারা জীবন পাপ-তাপ কিছু করেননি, বুড়ো বয়সে কি শেষে নরহত্যার পাপে পড়বেন?"

সদাশিব হাঁ করে চেয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। তার পর বললেন, "বটে! নরহত্যার পাপ? সেটা কী করে আমার ঘাড়ে অর্শাবে রে ধর্মপুত্তুর?"

সিদ্ধিনাথ যথেষ্ট বিনয়ের সঙ্গেই বলল, "আজ্ঞে, ভাল মানুষের ছেলেদের যে সব ঝিলের বাড়িতে থাকতে দিলেন ওদের অপঘাত তো ঠেকানো যাবে না। বাড়ির পড়ো-পড়ো অবস্থা। দেওয়াল-চাপা পড়ে সবগুলো মরবে যে!"

"তাতে আমার পাপ হবে কেন রে গো-মুখ্যু? ওরা তো দেখে-শুনেই ও-বাড়িতে থাকতে চাইছে। মরলে নিজেদের দোষে মরবে।"

"তা না হয় হল, কিন্তু আমাকেও যে বিদেয় করতে চাইছে। বলছে দেশে যাও, না হয় তীর্থ করে এসো।"

"সে তো ভাল কথাই বলছে। যা না।"

সিদ্ধিনাথ বেজার মুখ করে বলল, "আপনি তো বলেই খালাস। কিন্তু আমি, কেটেরহাট ছাড়া অন্য জায়গায় গিয়ে কি বাঁচব?"

সদাশিব চোখ মিটমিট করে সিদ্ধিনাথের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বললেন, "তোর বয়স কত হল, তা জানিস?"

"আজ্ঞে না।"

"তুই আমার চেয়েও অন্তত দশ-পনেরো বছরের বড়।"

"তা হবে। আপনাকে এইটুকু দেখেছি।"

"হিসেব করলে তোর যা বয়স দাঁড়ায়, তাতে তোর দু' বার মরার কথা।"

"তা বটে।"

"অথচ তুই একবারও মরিসনি।"

"তা বটে।"

"তা হলে কেটেরহাটের বাইরে গিয়ে যদি না বাঁচিস, তা হলেই বা দুঃখ কী?"
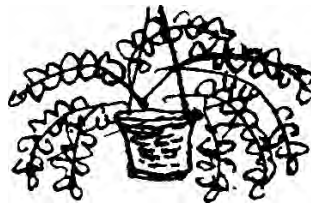
নবীন নিজে যেমন খেতে ভালবাসে, তেমনই লোকজনকে ডেকে খাওয়াতেও ভালবাসে। কিন্তু তার এখন যা অবস্থা, তাতে নিজেদেরই ভাল করে জোটে না, লোককে ডেকে খাওয়ানোর প্রশ্নই ওঠে না।

তবে বুড়ি পিসি কী একটা ব্রত করেছে, তাতে নাকি দ্বাদশ ব্রাহ্মণ ভোজন না করালেই নয়। ক' দিন ধরেই পিসি ঘ্যানঘ্যান করছে, নবীন কথাটা তেমন কানে তোলেনি।

কিন্তু আজ এসে পিসি ধরে পড়ল, "ও বাবা নবীন, তুই কি শেষে আমাকে চিরটা কাল নরক ভোগ করতে বলিস? নরক যে সাঙ্ঘাতিক জায়গা বাবা, যমদূতেরা বড়-বড় সাঁড়াশি লাল টকটকে করে গরম করে নিয়ে, তার পর তাই দিয়ে নাক-কান হাত-পা সব টেনে-টেনে ছেঁড়ে। তার পর হাঁড়ির মধ্যে গরম জলে ফেলে সেদ্ধ করতে থাকে। সেও শুনি হাজার হাজার বছর ধরে সেদ্ধ করতেই থাকে। মাঝে-মাঝে হাতা দিয়ে তুলে দেখে নেয়, ঠিক মতো সেদ্ধ হয়েছে কি না, আর তাতেই কি রেহাই আছে বাপ? সেদ্ধ হলে পর নাকি সর্বাঙ্গে নুন মাখিয়ে রোদে শুকোয়, তার পর হেঁটমুণ্ডু করে-করে ঝুলিয়ে রাখে, তার পর কাঁটার বিছানায় শুইয়ে রাখে, তার পর..."

নবীন মাথা নেড়ে-নেড়ে শুনছিল; বলল, "তার পর আর বাকি থাকে কী পিসি? এত কিছুর পর কি আর কেউ বেঁচে থাকে?"

পিসি মুখখানা তোম্বা করে বলল, "বাছা রে, একবার মরলে পরে আর যে মরণ নেই। নরকের ব্যবস্থাই তো ও রকম। যতই যা করুক না কেন, আর মরণ হবে না যে! তার পর সেখানে এঁটোকাঁটার বিচার নেই, চার দিকে নোংরা আবর্জনা আঁস্তাকুড়। একটু ভেবে দ্যাখ বাপ, মাত্র বারোটা বামুন খাওয়ালে যদি ফাঁড়াটা কাটে, তবে হাঁফ ছেড়ে বাঁচি।"

নবীন ম্লান মুখে বলল, "আচ্ছা পিসি, দেখছি কী করা যায়।"

পিসি নিশ্চিন্ত হয়ে চলে গেল। জানে, নবীনের মনটা বড় ভাল। ঠিকই ব্যবস্থা করবে।

নবীন দুপুরবেলা একতলায় নেমে এল। নাচঘরের দক্ষিণ-কোণে দেওয়ালের মধ্যে একটা ছোট্ট ছিদ্র। তার মধ্যে হাত ঢুকিয়ে একটা হাতল ঘোরালেই মেঝেতে একটা সিঁড়ির মুখ খুলে যায়। সরু সিঁড়ি, অন্ধকারও বটে।

সিঁড়ি দিয়ে টর্চ হাতে নবীন নেমে এল মাটির নীচে। চার দিকে একটা টানা গলি, মাঝখানে নিরেট পাতালঘর। পাথরের দেওয়াল, লোহার দরজা, নবীন অন্তত হাজারবার এই পাতালঘরে হানা দিয়েছে। দেওয়ালে বা দরজায় শাবল বা হাতুড়ি মারলে ফাঁপা শব্দও হয় না। এতই নিরেট।

নবীনের হাতে এখন একেবারেই টাকাপয়সা নেই। কারও কাছে হাত পেতেও লাভ নেই। কেউ দেবে না। সকলেই জানে যে, নবীনের অবস্থা খারাপ, তার বিষয়-সম্পত্তি মহাজনের কাছে বাঁধা। ধার নিলে নবীন শোধ করতে পারবে না।

নবীন পাতালঘরের দরজার সামনে বসে আকাশ-পাতাল ভাবতে লাগল। কী করা যায়?

নবীন বসে-বসে ভাবতে লাগল। ভাবতে-ভাবতে তার একটু ঢুলুনিও এসে গেল। ঢুলতে-ঢুলতে তার মাথার মধ্যে নানা চিন্তা হিজিবিজি ঘুরে বেড়াতে লাগল। মহাজন টের পাওয়ার আগেই গোপনে লোক লাগিয়ে পাতালঘরের দেওয়াল যদি ডিনামাইট দিয়ে উড়িয়ে দেওয়া যায়! অবশ্য তা হলে বাড়িটাও ধসে পড়তে পারে। যদি সুড়ঙ্গ কেটে ঢোকা যায়? যদি...

হঠাৎ তার কানে কে যেন মৃদু স্বরে বলে উঠল, "দূর বোকা! ওভাবে নয়।"

নবীন চমকে সোজা হয়ে বসে বলল, "কে?"

না, কেউ কোথাও নেই।

নবীন চার ধারটা খুব ভাল করে খুঁজে দেখল। কারও দেখা পেল না। পাতালে নামবার দরজাটা যেমন বন্ধ ছিল, তেমনই আছে।

খুবই চিন্তিতভাবে ওপরে উঠে এল। তার পর মহাদেবকে ডেকে বলল, "দ্যাখো মহাদেবদা, তুমি বহু পুরনো আমলের লোক। আজ যে ঘটনাটা ঘটল, তার মানেটা কী আমাকে বুঝিয়ে দেবে?"

মহাদেব খুব গম্ভীর মুখ করে ঘটনাটা শুনল, পাকা মাথাটি নেড়ে মাঝে-মাঝে 'হুঁ' দিল। তার পর অনেকক্ষণ ভেবে নিয়ে বলল, "না গো নবীনভায়া, ঠিক বুঝতে পারছি না।"

নবীন খুব আগ্রহের সঙ্গে বলল, "কিন্তু আমার মনে হচ্ছে, পাতালঘরে ঢোকার একটা সহজ পথ আছে।"

মহাদেব গম্ভীর মুখে বলল, "সেটা আমারও মনে হয়, তোমার ঠাকুরদাও সারাটা জীবন ওই পাতালঘরে সেঁধোবার চেষ্টা করেছেন। শাবল-গাঁইতিও কিছু কম চালানো হয়নি। শেষে একেবারে শেষ জীবনে তিনি চুপচাপ পাতালঘরের সামনে বসে থাকতেন। তার পর যখন মৃত্যুশয্যায় পড়ে আছেন, তখন আমি তাঁর কাছেই দিন-রাত মোতায়েন থাকতাম। এক ঝড়বৃষ্টির রাতে হঠাৎ তোমার ঠাকুর্দা চোখ মেলে চাইলেন। মুখখানা ভারী উজ্জ্বল দেখাচ্ছে। আমার দিকে চেয়ে বললেন, 'পেয়েছি রে, পেয়েছি।'"

নবীন সাগ্রহে বলল, "তার পর?"

মহাদেব মাথাটা হতাশায় নেড়ে বলল, "কী পেয়েছেন, সেইটে আর বলতে পারলেন না। জিজ্ঞেস করলাম, উনি শুধু বললেন, 'পাতালঘর।' তার পরই নেতিয়ে পড়লেন, চোখ উল্টে গেল, জিভ বেরিয়ে পড়ল। মরে গেলেন।"

"ইশ, অল্পের জন্য হল না তা হলে?"

"খুবই অল্পের জন্য। আমার মনে সেই থেকে বিশ্বাস, তুমি যে-রকম ভাবে দেওয়াল বা দরজা ভাঙাভাঙির চেষ্টা করে যাচ্ছ, সেভাবে হবে না।"

"তবে কীভাবে হবে? মহাজনের হাতে বাড়ি চলে যেতে তো আর দেরি নেই, মহাদেবদা।"

"সবই তো বুঝি নবীনভায়া, কিন্তু আমার বুড়ো মাথায় তো কোনও কিছুই খেলছে না, আমিও কি কিছু কম ভেবেছি!"

নবীন চিন্তান্বিত হয়ে বলল, "পাতালঘরে ঢোকা ছাড়া যে আর পথ দেখছি না মহাদেবদা। পিসি বারোজন বামুন খাওয়াবে, তা তারও পয়সা হাতে নেই। এ রকম করে চললে যে আমাকে আত্মহত্যা করতে হবে।"

মহাদেব ভ্রূ কুঁচকে বলল, "দ্যাখো নবীনভায়া, ওটা পুরুষ-মানুষের মতো কথা নয়। তোমার বংশ ডাকাতের বংশ। তার একটা খারাপ দিক আছে বটে, আবার একটা ভাল দিকও আছে। তোমার বংশের লোকের বুকের পাটা ছিল। তারা ফুলের ঘায়ে মূর্ছা যেত না। তোমাকেও সেই রকম হতে হবে। সাহসী হও, দুনিয়াটা দুর্বলদের জায়গা নয়।"

নবীন মুখখানা হাঁড়ি করে বসে রইল।

আংটি ছিল, মায়ের গয়না ছিল, পুরনো কিছু মোহর ছিল। সবই গেছে। এখন এই বসত-বাড়িটা ছাড়া আর কিছু অবশিষ্ট নেই। দিন আর চলে না। কোনও বন্দোবস্ত হলে বুড়ি পিসি আর বুড়ো মহাদেবদাকে নিয়ে গিয়ে

গাছতলায় দাঁড়াতে হবে।

বিকেলের দিকে নবীন গিয়ে গোপীনাথ মহাজনের কাছে হাজির হল।

গোপীনাথের কারবার অনেক। নানা রকমের ব্যবসা তার। তার মধ্যে একটা হল, চড়া সুদে টাকা ধার দেওয়া আর বন্ধক রাখা। কেটেরহাটে তার মতো ধনী আর প্রতাপশালী লোক কমই আছে এখন। তার হাতে মেলা লোকজন। হাতে মাথা কাটতে পারে।

গোপীনাথের চেহারাখানাও পেল্লায়। থলথলে ভুঁড়িদার চেহারা নয়, রীতিমতো পালোয়নের স্বাস্থ্য। চোখ দু' খানা সাঙ্ঘাতিক কুটিল। চোখের দিকে তাকালে যে-কোনও লোকেরই বুকটা গুড়গুড় করে উঠবে।

নবীন যখন তার সামনে গিয়ে হাজির হল, তখন গোপীনাথ তার বৈঠকখানায় বসে বাদামের শরবত খাচ্ছে আর নিজের পোষা ব্লাডহাউণ্ড কুকুরের মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করছে।

নবীনকে দেখে গোপীনাথ একটু বিরক্তির গলায় বলল, "কী খবর নবীনবাবু?"

নবীন কাঁচুমাচু মুখ করে বলল, "আপনার কাছে আজ আমার একটা প্রার্থনা আছে। এই শেষবার।"

গোপীনাথ বোধহয় এই সব বনেদি পড়তি বড়লোকের ছেলেদের বিশেষ পছন্দ করে না। শরবতের গেলাসটা ধীরেসুস্থে শেষ করে পাশের টেবিলে রেখে বলল, "পুরনো বাড়ি বাঁধা রেখে আপনাকে যা টাকা দিয়েছি, তাও আমার উশুল হবে না। যদি আর টাকা চান, তা হলে আগেই বলি, এক পয়সাও দিতে পারব না।"

নবীন মৃদুস্বরে বলল, "কিন্তু আমার পিসিকে যমদূতেরা নাকি গরম সাঁড়াশি দিয়ে ছিঁড়বে, কয়েক হাজার বছর ধরে সেদ্ধ করবে, রোদে শুকিয়ে হেঁটমুণ্ড করে রাখবে। তার পর আবার কাঁটার বিছানায় শোওয়াবে...ওফ...সে ভাবা যায় না..."

গোপীনাথ চোখ গোল করে এ সব শুনল, তার পর বলল, "বটে? তা পিসিকে এত সব খবর কে দিল?"

নবীন অম্লান বদনে বানিয়ে বলল, "আজ্ঞে কয়েক দিন আগে এক মস্ত তান্ত্রিক এসেছিলেন বাড়িতে। যদুপুরের অঘোরবাবা নাম নিশ্চয়ই শুনেছেন, সাক্ষাৎ পিশাচসিদ্ধ। স্বর্গ-মর্ত্য-পাতালে অনবরত যাতায়াত করেন। তিনি নরকের একেবারে হালের খবর এনে দিয়েছেন।"

গোপীনাথের মুখটা কেমন যেন পাঁশুটে মেরে গেল। চাকরকে ডেকে কুকুরটাকে নিয়ে যেতে বলে কিছুক্ষণ গুম হয়ে বসে রইল গোপীনাথ। তার পর বলল, "যদিও আমি ও সব গাঁজাখুরিতে বিশ্বাস করি না, 'অঘোরবাবা' বলে কারও নামও আমি শুনিনি, তবে নরকের ব্যাপারটা যেন কে আমাকে বলেছিল বটে।"

"আজ্ঞে, কী বলেছিল?"

"আরও খারাপ। দু' পায়ে দুই তেজী ঘোড়াকে বেঁধে দু' ধারে ছুটিয়ে দেওয়া হয়। ফলে একেবারে মাঝখান দিয়ে চিরে দু' ফালা হয়ে যায় লোকে।"

"আজ্ঞে, নতুন নতুন গ্যাজেট তো নরকেও বেরোচ্ছে। হয়তো গায়ে জোঁক ছেড়ে দেয়, শুঁয়োপোকা ছেড়ে দেয়..."

"ও বাবা!"

গোপীনাথ নিমীলিত নয়নে কিছুক্ষণ নরকের দৃশ্যটাই বোধহয় কল্পনার চোখে প্রত্যক্ষ করে নিল। তার পর হঠাৎ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে প্রবল কণ্ঠে বলে উঠল, "তারা ব্রহ্মময়ী, তুমিই ভরসা। সব সামাল দিও মা..."।

নবীন মৃদু হেসে বলল, "আজ্ঞে শুনেছি, গরিব ব্রাহ্মণকে সাহায্য করলে নাকি যমদূতেরা আর ততটা অত্যাচার করে না। ধরুন, সাঁড়াশিটা হয়তো তেমন গরম করল না, সেদ্ধটা ভাল রকম হওয়ার আগেই তুলে ফেলল, কিংবা নুন মাখানোর বদলে পাউডার মাখাল..."

গোপীনাথ কটমট করে নবীনের দিকে চেয়ে বলল, "কত চান বলুন তো?"

মাথা চুলকে নবীন একটু ভাবল। লোককে খাওয়াতে সে খুবই ভালবাসে। দ্বাদশ ব্রাহ্মণের সঙ্গে যদি আরও কয়েকজন বন্ধুবান্ধব এবং পাড়া-প্রতিবেশীকে খাইয়ে দেওয়া যায়, তা হলে মন্দ কী!

"আজ্ঞে, দ্বাদশ ব্রাহ্মণের জন্য দ্বাদশ শত অথাৎ কিনা বারোশো টাকা হলেই চলবে।"

গোপীনাথ এত অবাক হল যে, প্রথমটায় মুখে বাক্য সরল না। তার পর বলল, "আপনি জানেন যে, আমার নিজের এক দিনের খোরাকি মাত্র বারো টাকা?"

"বড়লোকদের একটু কমই লাগে। তাদের খিদেও কম, খাওয়াও কম। কিন্তু গরিবদের তো তা নয়। তারা কষি খুলে, প্রাণ হাতে নিয়ে খায়। একেবারে হাঘরের মতো। একটু বেশি তো লাগবেই।"

গোপীনাথ বিজ্ঞের মতো বলল, "আপনাকে যে টাকা দিতে রাজি হয়েছি, এই ঢের জানবেন। কুল্যে পঞ্চাশটা টাকা দিচ্ছি, ওইতেই বামুনদের চিঁড়ে-দই ফলার করান তো।"

নবীন ভারী বিনয়ের সঙ্গে বলল, "তার চেয়ে পিসি বরং নরকেই যাক গোপীবাবু। বামুন না-খাওয়ালে মেয়াদ কিছু কম হতে পারে। পিসির পাপ-টাপও বেশি নেই, সহজে উদ্ধার হয়ে যাবে। আর ফলার খাওয়ালে? বারোটা বামুনের অভিশাপ ঘাড়ের ওপর গদাম গদাম করে এসে পড়লে, নরকের যমদূতেরা পিসির গায়ে কাঁকড়া বিছেও ছেড়ে দেবে।"

গোপীনাথ একটু শিউরে উঠল, "তারা ব্রহ্মময়ী! দেখো মা। যাক গে, বারোশো টাকার সুদ গুনতে পারবেন তো? বড় কম হবে না।"

"যে আজ্ঞে।"

"আর শুনুন, ফের সাবধান করে দিচ্ছি, ওই পাতালঘরের ধারেকাছে কিন্তু আর যাবেন না। বাড়ি, বলতে গেলে, এখন আমারই। কোনও রকম ভাঙচুর হলে কিন্তু মুশকিলে পড়বেন। মনে থাকে যেন।"

"যে আজ্ঞে।"

খাজাঞ্চিকে ডাকিয়ে হ্যান্ডনোট লেখানোর পর নবীনকে টাকা দিয়ে দিল গোপীনাথ। আচ্ছা চশমখোর লোক। বারোশো টাকার এক মাসের সুদও ধরা হয়েছে বারোশো টাকাই। শোধ দিতে না পারলে চক্রবৃদ্ধি হারে ঋণ বেড়ে যাবে।

তবে নবীন বড় একটা ভবিষ্যতের ভাবনা ভাবে না। তার চিন্তা বর্তমানকে নিয়ে। সে টাকা নিয়ে বাড়ি এসে সোল্লাসে বলে উঠল, "পিসি, আর ভয় নেই। যমদূতেরা আর তোমাকে ছুঁতেও পারবে না। বারোটা বামুনের খাওয়ার জোগাড় করো।"

পিসি আহ্লাদে চোখের জল ফেলতে লাগল। বলল, "আমি যদি স্বর্গে যাই, তোকেও টেনে নেব বাপ, দেখিস। সেখানে ভারী ভাল ব্যবস্থা।"

"সেখানে কী রকম ব্যবস্থা গো পিসি?"

"সকালে উঠলেই দুধের সর দিয়ে খইয়ের মোয়া। বুঝলি? তার পর দুপুরে পোলোয়া তো রোজই হয়। অ্যাই বড়-বড় চিতল মাছের পেটি খাবি। তার পর বিকেলে গাওয়া ঘিয়ের লুচি। রাতে মাংস, পায়েস, কত কী!"

"আর কী?"

"ও রে, স্বর্গে কি কিছুর অভাব! সেখানে শীতকালে ল্যাংড়া আম, গ্রিষ্মিকালে কমলালেবু। চালে কাঁকর নেই। আরও একটা ভাল জিনিস হল, স্বর্গে নাকি একাদশী করতে হয় না।"

"তা হলে তো দারুণ জায়গা পিসি।"

পিসি ফোকলা মুখে হেসে বলল, "তবে?"

পিসির বামুন আর নবীনের বন্ধু-বান্ধব মিলে বড় কম হবে না। বিরাট আয়োজন করতে হবে। বহু দিন বাদে নবীনের মনে বড় স্ফূর্তি এল। সে গুনগুন করে গান গাইতে গাইতে বাগানে বেড়াতে গেল।

নবীনের বাগানটারও কোনও ছিরিছাঁদ নেই। দেখাশোনা করা হয় না বলে আগাছায় ভরে গেছে। তারই মধ্যে স্থলপদ্ম বা গোলাপও যে ফোটে না এমন নয়। তবে বাগানের চেয়ে জঙ্গল বললেই ঠিক বলা হয়।

বাগানে এক সময়ে পাথরের পরী, ফোয়ারা এসব ছিল। পরী বহু কাল আগে মুখ থুবড়ে পড়ে গেছে, তাকে আর তোলা হয়নি। ফোয়ারা বহু কাল বন্ধ।

ফোয়ারার ধারটা এক সময়ে চমৎকার বাঁধানো ছিল। বাড়ির লোকেরা তার ধারে বসে বিকেল কাটাত। এখনও নবীন এসে ফোয়ারার ধারেই বসে।

আজও নবীন ফোয়ারার ধারে বসে আকাশ-পাতাল ভাবছিল। কত কী যে সে ভাবে। ভোজটা হয়ে গেলে হাতে যা টাকা থাকবে, তাই দিয়ে সে একবার হরিদ্বার ঘুরে আসবে। সে বার হৃষিকেশের এক সাধু তাকে

একটা স্ফটিকের মালা দেবে বলেছিল। বেজায় সস্তা। মাত্র দেড়শো টাকা দাম। সাধুকে খুঁজে পেলে মালাটা কিনে ফেলবে। আরও কত কী করবে সে... শুধু পাতালঘরটা যদি একবার খুলতে পারত!

দাদু কি সত্যিই পাতালঘর খোলার হদিস পেয়েছিল? কীভাবে পেয়েছিল?

কাছেই কে যেন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। নবীন চমকে উঠে চেয়ে দেখল, কেউ কোথাও নেই।

একটু নড়েচড়ে বসল সে।

হঠাৎ ফটকের ও পাশ থেকে কে যেন হাঁক দিয়ে তাকে ডাকল, "নবীন! বলি ও নবীন! বাড়ি আছ নাকি?"

নবীন গিয়ে দ্যাখে, সদাশিববাবু।

"আজ্ঞে আসুন। গরিবের বাড়ি অনেক দিন পায়ের ধুলো দেননি।"

সদাশিববাবু নবীনের দিকে চেয়ে বললেন, "কী সব শুনছি বলো তো?"

"আজ্ঞে?"

"তুমি নাকি ফের টাকা ধার করেছ?"

নবীন লজ্জিতভাবে মাথা চুলকোতে লাগল। এই সদাশিববাবুর পূর্বপুরুষদের সঙ্গে নবীনের পূর্বপুরুষদের সাঙ্ঘাতিক শত্রুতা ছিল এক সময়ে। এ-ওকে পেলে ছিঁড়ে ফেলে আর কি। দু' পক্ষের লোকজনের হাতে পারস্পরিক খুন-জখম লেগেই থাকত। বড় ঝিলে যে কত লাশ ফেলা হত, তার হিসেব নেই। নবীনের ঠাকুরদার আমলেও সেই রেষারেষি ছিল। এই আমলে আর নেই। নবীনের অবস্থা খুবই পড়ে গেছে, সদাশিববাবুর অবস্থা সেই তুলনায় যথেষ্ট ভাল। রেষারেষি হয় সমানে-সমানে।

নবীন বলল, "আজ্ঞে, পিসি কী একটা ব্রত করেছে। দ্বাদশ ব্রাহ্মণ না খাওয়ালেই নয়।"

সদাশিব নবীনকে ভালই চেনেন। বললেন, "সে তো ভাল কথা। কিন্তু তুমি যে শুনছি গোপীনাথের কাছ থেকে বারোশো টাকা ধার নিয়েছ। এত টাকা শুধবে কী করে ভেবে দেখেছ?"

"আজ্ঞে না।"

সদাশিববাবু বাগানে ঢুকে চার দিকটা চেয়ে দেখলেন। তার পর দুঃখের সঙ্গে মাথা নেড়ে বললেন, "কী বাড়ি ছিল, কী হাল হয়েছে! এ যে চোখে দেখা যায় না হে নবীন।"

"যে আজ্ঞে।"

"পাতালঘরটা খুলবারও তো কোনও ব্যবস্থা হল না। হলে, কে জানে, হয়তো কিছু পেয়েও যেতে পারতে। তোমার ঊর্ধ্বতন ষষ্ঠ পুরুষ তো হৃদয়পুর কাছারি লুঠ করে মেলা টাকা এনেছিল। অথচ সেটা লুঠ করার কথা আমার ঊর্ধ্বতন পঞ্চম পুরুষ জয়শিবের।"

নবীনের একটু আঁতে লাগল। সে বলল, "আজ্ঞে, ব্যাপারটা মোটেই তা নয়। জয়শিব হৃদয়পুরের লেঠেলদের ভয়ে কাছারি লুঠ করার পরিকল্পনা ত্যাগ করেন। আমার ঊর্ধ্বতন ষষ্ঠ পুরুষ কালীচরণ সাহসী পুরুষ ছিলেন। তিনি একাই উনিশজন লেঠেলকে ঘায়েল করেন। একথা সবাই জানে।"

সদাশিব ভ্রূ কুঁচকে বললেন, "তুমি কিছুই জানো না। জয়শিব আর কালীচরণ, দু'জনের নিবিড় বন্ধুত্ব ছিল। বলতে গেলে কালীচরণ ছিলেন জয়শিবের অনুগত। ডান হাত। দু'জনের একসঙ্গেই কাছারি লুঠ করতে যাওয়ার কথা। অথচ জয়শিবের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে কালীচরণ আলাদা লোকজন নিয়ে গিয়ে আগেভাগেই কাছারি লুঠ করে সব টাকাপয়সা লুকিয়ে ফেলেন।"

“আজ্ঞে, কথাটা মোটেই ঠিক নয়। কালীচরণ কোনও দিনই কারও তাঁবেদারি করেননি। জয়শিবের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব ছিল ঠিকই, কিন্তু তিনি তাঁর অনুচর ছিলেন না। তাঁর বরাবরই আলাদা দল ছিল।”

“ইতিহাস তা বলে না রে, বাপু।”

“আজ্ঞে, তা-ই বলে। জয়শিব ভিতু ছিলেন।”

“কালীচরণ ছিলেন বিশ্বাসঘাতক।”

দু'জনের মধ্যে একটা বচসা বেধে উঠেছিল প্রায়। কিন্তু ঠিক এই সময়ে ঝোপের আড়াল থেকে কে যেন বলে উঠল, “দুজনেই খুব খারাপ ছিল।”

সঙ্গে-সঙ্গে সদাশিব বলে উঠলেন, “জয়শিব খারাপ ছিলেন না। তাঁর অনেক দানধ্যান ছিল।”

নবীনও বলে উঠল, “কালীচরণের মতো সাধু লোক কমই ছিল। ধ্যানে বসে তিন হাত ওপরে উঠে যেতে পারতেন।”

তার পর দু'জনেরই খেয়াল হল, কথাটা বলল কে আড়াল থেকে?

“নবীন, কথাটা কে বলল দ্যাখো তো! কোন বেয়াদব?”

ঝোপের আড়াল থেকে সাহেবি পোশাক-পরা একটা লোক বেরিয়ে এসে বলল, “আমি বলেছিলাম।”

সদাশিব লোকটার দিকে বিরক্তির চোখে তাকিয়ে বললেন, “তুমি! তা তুমি এখানে উদয় হলে কী করে?”

অভিজিৎ মৃদু হেসে বলল, “চারদিকটা ঘুরে-ঘুরে দেখছিলাম। এখানে তো পোকামাকড়ের অভাব নেই। এই জঙ্গলটা দেখে আর লোভ সামলাতে পারিনি।”

“আড়াল থেকে অন্যের কথা শোনাটা ভাল কাজ নয়।”

অভিজিৎ জিভ কেটে বলল, “ইচ্ছে করে শুনিনি। একটা ক্যাটারপিলার দেখতে পেয়ে সেটাকে একটু অবজার্ভ করছিলাম। কানে আপনাদের কথা আসছিল। শুনে মনে হল, আপনাদের দু'জনেরই পূর্বপুরুষরা ডাকাত ছিলেন।”

“ছিলেন তো কী! সে-আমলে ডাকাতদেরও ইজ্জত ছিল। জয়শিবকে ব্রিটিশ সরকার 'রায়সাহেব' উপাধি দিতে চেয়েছিল তা জানো?”

নবীনও বলে উঠল, “আর কালীচরণকে সোনার মেডেল।”

অভিজিৎ হাত তুলে বলল, “ঘাট হয়েছে। আপনাদের দু'জন পাছে ঝগড়া পাকিয়ে তোলেন, তাই আড়াল থেকে কথাটা বলে ফেলেছি। কিছু মনে করবেন না। আচ্ছা, আপনিই তো নবীনবাবু?”

নবীন বলল, “আজ্ঞে হ্যাঁ।”

“আপনার এই বাড়িটা ভারী অদ্ভুত। বাগানে পোকা-মাকড় খুঁজতে-খুঁজতে আমি জঙ্গলটায় কয়েকটা জিনিস আবিষ্কার করে ফেলেছি।”

“কী বলুন তো?”

“ওই দক্ষিণের দিকে ঘাস-জঙ্গলের মধ্যে একটা ঢাকনা দেওয়া কুয়ো আছে। ওটা কিসের বলুন তো?”

নবীন বেজার মুখে বলল, “কুয়ো আর কিসের হবে। জলের।”

সদাশিব অট্টহাসি হেসে বললেন, “জলের না হাতি! ওর ঠ্যাঙাড়ে পূর্বপুরুষেরা মানুষ মেরে ওই কুয়োয় লাশ ফেলত। খুঁজলে ওর মধ্যে বিস্তর কঙ্কাল পাওয়া যাবে।”

সদাশিব উঠে পড়লেন, "চলো হে অভিজিৎ।"

নবীন বেজার মুখ করে ফোয়ারার ধারে বসে রইল। বসে পূর্বপুরুষদের কথা ভাবতে লাগল।

ভুজঙ্গ গাড়িটা রাস্তার ধারে দাঁড় করিয়ে বলল, "এই সেরেছে!"

পিছন থেকে অনু অর্থাৎ অনন্যা বলল, "কী হয়েছে ভুজঙ্গদা?"

"গাড়িটা গড়বড় করছে গো দিদিভাই। এতটা পথ দিব্যি চলে এলাম। আর মোটে মাইল চারেক পথ বাকি। একেবারে তীরে এসে তরী ডুবল রে ভাই।"

ভুজঙ্গ নেমে বনেট খুলে খুটখাট করতে লাগল।

বিলু অর্থাৎ বিল্বশিব দিব্যি ঘুমোচ্ছিল গুটিসুটি মেরে শুয়ে। দুই ভাই-বোন' পালা করে ঘুমোনোর কথা। কিছুক্ষণ অনু ঘুমিয়েছে, এবার বিলু।

অনু ডাকল, "এই বিলু, ওঠ ওঠ।"

বিলু ধড়মড় করে উঠে পড়ে বলল, "এসে গেছি! ওফ, আমার যা খিদে পেয়েছে না। ঠাকুমা নিশ্চয় ডালপুরি করেছে। গন্ধ পাচ্ছি।"

অনু হেসে বলল, "খুব তোর নাক! চার মাইল দূর থেকে ডালপুরির গন্ধ পাচ্ছিস!"

"চার মাইল!"

"গাড়ি খারাপ। আমাদের হয়তো হেঁটে যেতে হবে।"

শীতকাল বলে সন্ধ্যা তাড়াতাড়ি নামছে। এর মধ্যেই আলো সরে চার দিকটা গাঢ় কুয়াশায় ঢেকে গেছে। দু' ধারে জঙ্গল। লোকবসতি বিশেষ নেই।

বিলু নেমে গিয়ে ভুজঙ্গের পাশে দাঁড়িয়ে গাড়ির মেরামতি দেখতে লাগল।

"কী হয়েছে গো ভুজঙ্গদা?"

"ইঞ্জিন গরম হয়ে গেছে, তেলে ময়লা আসছে, ব্যাটারিও যেন মনে হচ্ছে ডাউন। বরাতটাই খারাপ দেখছি। একসঙ্গে এতগুলো গণ্ডগোল তো সহজে হয় না।"

"তা হলে কী হবে!"

ভুজঙ্গ বলল, "গাড়ি বরং এখানে থাক। পরে বচন তার লোকজন নিয়ে এসে ঠেলে নিয়ে যাবে। আমি সুটকেসটা নিই, তোমরা দু'জন ব্যাগগুলো কাঁধে ঝুলিয়ে নাও। তার পর চলো, হেঁটে চলে যাই।"

এ-কথায় বিলু লাফিয়ে উঠে বলল, "সেইটেই ভাল হবে। চলো, ডাকাতে কালীবাড়ির রাস্তা দিয়ে শর্টকাট করি। ওখানে এক সময়ে ঠ্যাঙাড়েরা মানুষ মারত।"

ভুজঙ্গ চিন্তিতভাবে বলল, "ও রাস্তায় মাইলটাক পথ কমে যাবে ঠিকই, কিন্তু..."

অনন্যা নেমে এসে চুপচাপ দাঁড়িয়ে দু'জনের কথা শুনছিল। একটু হেসে বলল, "কিসের ভয় ভুজঙ্গদা? আমি ক্যারাটে-কুংফু জানি। তুমিও এক সময়ে সার্কাসে খেলা দেখাতে। ভয়টা কিসের? একমাত্র বিলুটাকে নিয়েই যা চিন্তা। ও তো কিছু জানে না!"

বিলু বিদির বেণীটা একটু নেড়ে দিয়ে বলল, "বেশি ফটফট করিস না। স্কুলে প্রত্যেকবার হান্ড্রেড মিটারে কে ফার্স্ট হয়?"

অনন্যা বলল, "দৌড় তো একটা-কাজেই লাগে। পালানোর সময়। যাই হোক, বিপদে পড়লে তুই অন্তত পালাতে পারবি।"

ভুজঙ্গ লাগেজ বুট থেকে সুটকেস নামিয়ে আনল। বড়দিনের বন্ধে সপ্তাহখানেক ছুটি কাটাতে ভাইবোন দাদুর কাছে যাচ্ছে। কাজেই মালপত্র এবার একটু বেশি। বিলু আর অনু চটপট তাদের হ্যান্ডব্যাগ নামিয়ে নিল।

গাড়ি লক করে তিনজনে হাঁটা ধরল। সঙ্গে টর্চ আছে, অন্ধকার হয়ে গেলে চিন্তা নেই।

সিকি মাইল এগোলে ডান ধারে ডাকাতে কালীবাড়ির রাস্তা। দিনমানেও লোক-চলাচল বিশেষ নেই। জঙ্গলে কিছু লোক কাঠকুটো কুড়োতে যায়। গ্রাম বা লোকবসতি না থাকায় পথটা ভারী নির্জন।

ঝোপ-ঝাড়ের ভিতর দিয়ে সরু রাস্তা। এই রাস্তা গিয়ে ঝিলের পাশ দিয়ে কেটেরহাটে ঢুকেছে। শোনা যায়, এই রাস্তাই ছিল এক সময়ে কেটেরহাটের সঙ্গে বহির্জগতের একমাত্র সংযোগ-পথ। কিন্তু ঠ্যাঙাড়ে আর ডাকাতদের অত্যাচারে সন্ধের পর এ-রাস্তায় কেউ পা দিত না। এখন আর ঠ্যাঙাড়ে বা ডাকাতদের ভয় নেই, কিন্তু তবু লোকে পথটা এড়িয়েই চলে।

ডাকাতে কালীবাড়ির রাস্তায় যখন তারা পা দিল, তখন অন্ধকার বেশ ঘনিয়ে উঠেছে। মালপত্র নিয়ে খুব তাড়াতাড়ি হাঁটা সম্ভব নয়। তবু তারা যথাসাধ্য দ্রুত হাঁটছিল।

বিলু ডাকল, "ভুজঙ্গদা!"

"বলো দাদাবাবু।"

"কালীবাড়িটা কত দূর?"

"মাঝামাঝি পড়বে।"

"এখনও কি সেখানে পুজো হয়?"

"পাগল! কালীবাড়ি এখন শেয়ালের আস্তানা।"

"আচ্ছা, আমাদের পূর্বপুরুষেরা তো ডাকাত ছিল!"

"তা ছিল। কেটেরহাটের বারো আনা লোকই ডাকাত ছিল।"

"তারা কি কুংফু-ক্যারাটে জানত?"

"জানত বই কী, ভালই জানত।"

"দিদিও জানে?"

"হ্যাঁ।"

"দিদি, তুই তা হলে দেবী চৌধুরানির মতো ডাকাত হয়ে যা।"

"বয়ে গেছে। ডাকাত তো তুই হবি। যা বাঁদর হয়েছিস!"

"আমি হব টিনটিন। ভুজঙ্গদা হবে আমার ক্যাপ্টেন হ্যাডক, আর দাদুকে বানাব প্রোফেসর ক্যালকুলাস।"

ভুজঙ্গ মাঝে-মাঝে সুটকেসটা নামিয়ে রেখে একটু জিরিয়ে নিচ্ছিল। বলল, "ডাকাতে কালীবাড়ি আর দূরে নয়। ওটা পেরোলেই ঝিলের ধারে গিয়ে পড়ব। ওখান থেকে কেটেরহাটের আলো দেখা যায়।"

ঝিঁঝির শব্দ হচ্ছে। মাঝে-মাঝে শেয়াল ডেকে উঠছে ঝাঁক বেঁধে। গাছে পাখিদের ঝটাপটি। জোনাকি জ্বলছে থোকা-থোকা।

"ভুজঙ্গদা, তুমি ভূতে বিশ্বাস করো?"

"খুব করি দাদাবাবু।"

"কখনও দেখেছ?"

"না। তবে জানি।"

"আমি করি না।"

অনু ফোড়ন কাটল, "আর সাহস দেখাতে হবে না। এখনও একা ঘরে শুতে পারিস না।"

তিনজনে ফের রওনা হতে যাবে, ঠিক এই সময়ে জঙ্গল ভেঙে কাছাকাছি কী একটা যেন দৌড়ে গেল।

ভুজঙ্গ বলল, "শেয়াল। চলো।"

তিনজনে নিঃশব্দে এগোতে লাগল। আঁকাবাঁকা পথ। দু' ধারের গাছপালা ঝুঁকে এসে পড়েছে পথের ওপর। গায়ে লেগে খরখর শব্দ হচ্ছে।

হঠাৎ কাছেই একদল শেয়াল চেঁচাল।

ভুজঙ্গ হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে বলল, "ওই যে! ওই হল কালীবাড়ি। কিন্তু...এ কী!"

বিলু বলল, "কী হল ভুজঙ্গদা?"

"কালীবাড়িতে আলো কিসের?"

এ-জায়গায় চারদিকেই নিবিড় বাঁশবন। বাঁশবনের ভিতরে বাঁ ধারে প্রায় তিনশো গজ দূরে প্রাচীন কালীবাড়ির ধ্বংসাবশেষ। গাছ-টাছ গজিয়ে জায়গাটার এমন অবস্থা হয়েছে যে, দিনের বেলাতেও ধ্বংসস্তূপটাকে ভাল করে ঠাহর হয় না। ঘুটঘুটি অন্ধকারে সেই ধ্বংসস্তূপ থেকে একটা মৃদু আলোর রেশ আসছিল। ভাল করে ঠাহর করলে দেখা যায়, নইলে নয়।

বিলু বলল, "অবাক হচ্ছ কেন? কেউ হয়তো আছে। ওখানে।"

ভুজঙ্গ সন্দিহান গলায় বলল, "কেটেরহাটে আমার জন্ম, বুঝলে? আমি এ-জায়গার নাড়ি-নক্ষত্র জানি। এ-তল্লাটের লোক কেউ এখানে সন্ধের পর আসবার সাহস রাখে না। তোমরা এখানে দাঁড়াও, ব্যাপারটা আমাকে একটু দেখতে হচ্ছে।"

অনু বলে উঠল, "তুমি একা যাবে কেন? চলো, আমরাও সঙ্গে যাচ্ছি।"

"তোমরা যাবে! কী দরকার। আমি যাব আর আসব।"

"আমরা অত ভিতু নই ভুজঙ্গদা। চলো, দেখি কোন ভূত-প্রেত-দত্যি-দানো ওখানে আস্তানা গেড়েছে।"

ভুজঙ্গ টর্চ হাতে আগে-আগে চলল, এক হাতে সুটকেস। পিছনে অনু আর বিলু।

"এই যাঃ!"

"কী হল ভুজঙ্গদা?"

"আলোটা যে নিবে গেল!"

তিনজনেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। বাস্তবিকই কালীবাড়ির আলোটা আর নেই।

বিলু বলল, "তা হলো চলো, ফিরে যাই। আমার খিদে পেয়েছে।"

ভুজঙ্গ বলল, "আলো নিবে গেল তো কী! কেউ হয়তো এখনও ওখানে আছে। একবার দেখে যাওয়া ভাল।"

তিনজনে আবার এগোতে লাগল। গাছপালায় সরসর শব্দ হচ্ছে। আশপাশ দিয়ে শেয়ালের দৌড়-পায়ের আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। ভারী নির্জন আর ছমছম কছে চার ধার।

কালীবাড়িটা এক সময়ে বেশ বড়ই ছিল। সামনে মস্ত নাটমন্দিরের ধ্বংসাবশেষ। মূল মন্দিরের কিছুই এখন আর অবশিষ্ট নেই। চার দিকে শুধু ইট আর সুরকির স্তূপ জমে আছে।

মন্দিরের পিছনে এক সময়ে পুরোহিত থাকতেন। দু'খানা পাকা ঘর, একটু বারান্দা, একটা পাতকুয়ো। এই বাড়িটা হয়তো মন্দিরের মতো পুরনো নয়। পরবর্তীকালে তৈরি হয়েছিল। সেই ঘর দু'খানা এখনও কালজীর্ণ হয়েও কোনও রকমে খাড়া আছে।

ভুজঙ্গ বলল, "আলোটা জ্বলছিল ওই ঘরে।"

টর্চের আলোয় দেখা গেল, দরজা-জানালাহীন দু'খানা ঘর হাঁ-হাঁ করছে। সামনে হাঁটুসমান ঘাস-জঙ্গল।

"তোমরা আর এগিও না। এখানেই দাঁড়াও। আমি আসছি।"

সুটকেসটা রেখে ভুজঙ্গ টর্চ জ্বেলে এগিয়ে গেল।

বিলু আর অনু চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল গা ঘেঁষাঘেঁষি করে। তারা ভিতু নয় ঠিকই, কিন্তু এই অচেনা পরিবেশে তাদের কিছু অস্বস্তি হচ্ছিল।

হঠাৎ ভুজঙ্গর গলা শোনা গেল, "বিলু, অনু, শিগগির এসো।"

ভাই-বোনে দৌড়ে গেল। বাঁ দিকের ঘরটার মেঝেতে হাঁটু গেড়ে বসে আছে ভুজঙ্গ। মেঝের ওপর একটা লোক পড়ে আছে। টর্চের আলোয় দেখা গেল, রক্তে মেঝে ভেসে যাচ্ছে।

বিলু আর অনু প্রায় একসঙ্গে বলে উঠল, "এ কে, ভুজঙ্গদা?"

ভুজঙ্গ মুখটা তুলে বলল, "সিদ্ধিনাথ।"

"কে সিদ্ধিনাথকে মারল?"

"ও কি মরে গেছে?"

ভুজঙ্গ মাথা নেড়ে বলল, "মরেনি। নাড়ি চলছে। তবে মাথায় চোট লেগেছে। বেশিক্ষণ এইভাবে থাকলে রক্ত বেরিয়েই মরে যাবে। বয়সও তো কম নয়।"

অনু বলল, "তা হলে কী করবে এখন?"

"ফেলেও তো যেতে পারি না।"

বিলু বলে উঠল, "কাঁধে করে নিয়ে গেলে কেমন হয়?"

ভুজঙ্গ মাথা নেড়ে বলল, "কাঁধে ঝুলিয়ে নিয়ে গেলে ওর মাথাটা নীচের দিকে থাকবে। সেটা ওর পক্ষে ভাল হবে না। একমাত্র উপায় হচ্ছে একটা খাটিয়া-টাটিয়া জোগাড় করে চার-পাঁচজন মিলে বয়ে নিয়ে যাওয়া।"

অনু আর বিলু পরস্পরের দিকে চেয়ে নিয়ে বলল, "আমরা তো তিনজন আছি।"

ভুজঙ্গ বলল, "তিনজনে হবে না। আমাদের নিজেদেরও মালপত্র আছে। তা ছাড়া, খাটিয়া পাব কোথায়? তার চেয়ে তোমরা দু'জন যদি গিয়ে লোকজন পাঠাতে পারো তবে হয়। আমি সিদ্ধিনাথকে পাহারা দিচ্ছি। যারা ওকে মেরেছে, তারা আশেপাশে কোথাও ওঁত পেতে থাকতে পারে। পুরোটা মারতে পারেনি, বোধহয় আমাদের সাড়া পেয়ে পালিয়েছে। তবে ফিরে আসতে পারে।"

বিলু চোখ গোল করে বলল, "তুমি একা থাকবে?"

"উপায় কী? সিদ্ধিনাথ অনেক দিনের বন্ধু আমার। ওকে ফেলে তো যেতে পারি না। এখন কথা হল, বাকি রাস্তাটা তোমরা যেতে পারবে কি না।"

অনু মাথা নেড়ে বলল, "খুব পারব।"

"যদি তোমাদের কিছু হয়, তবে কর্তাবাবু আমাকে গুলি করে মেরে ফেলবেন।"

অনু বলল, "কিছু হবে না ভুজঙ্গদা। আমি অত ভিতু নই।"

"তা হলে দেরি ক'রো না। রুমাল দিয়ে সিদ্ধিনাথের মাথাটা বেঁধেছি বটে, কিন্তু ভালমতো ব্যাণ্ডেজ করতে হবে। কে জানে, হয়তো স্টিচও লাগবে। পারলে ফটিক ডাক্তারকেও পাঠিয়ে দিও। সুটকেসটা থাক, পরে লোকজন এলে নিয়ে যাওয়া যাবে।"

বিলু একটু মিনমিন করে বলল, "দিদি আর আমি! না বাবা, আমি বরং থাকি। দিদি একা যাক।"

ভুজঙ্গ একটু হেসে বলল, "তুমি না পুরুষমানুষ! অত ভয় কিসের? রাস্তা আর বেশি তো নয়। একটু গেলেই ঝিলের ধারে পড়বে। ওখান থেকে কেটেরহাট দেখা যায়।"

অনিচ্ছার সঙ্গে বিলুকে রাজি হতে হল।

কখন সন্ধে হয়ে অন্ধকার নেমেছে, তা নবীনের খেয়াল ছিল না। ভাঙা ফোয়ারার ধারে বসে পূর্বপুরুষদের কথা ভাবতে ভাবতে সে একেবারে বিভোর হয়ে গিয়েছিল।

পূর্বপুরুষদের সঙ্গে তার কখনও দেখা-সাক্ষাৎ হয়নি বটে, কিন্তু তাঁদের গল্প সে মেলাই শুনেছে। তাঁরা ডাকাতি করে বেড়াতেন বটে, কিন্তু গরিব-দুঃখীদের উপকারও করতেন খুব। যে গাঁয়ে জল নেই, সেখানে পুকুর কাটিয়ে দিতেন; যার ঘর পড়ে গেছে, তার ঘর তুলে দিতেন; বিপন্নকে রক্ষা করতেন; জমিদারের পাইকরা হামলা করলে উলটে তাদের শিক্ষা দিয়ে দিতেন। তাঁরা প্রায়ই বিশাল ভোজ দিয়ে পাঁচ-সাতটা গাঁয়ের লোককে ডেকে আকণ্ঠ খাওয়াতেন। তাঁদের যত দোষই থাক, গুণেরও অভাব ছিল না। তার এক পূর্বপুরুষ এক-ডুবে নদী পারাপার করতে পারতেন। আর একজন এমন লাঠি ঘোরাতেন যে, বন্দুকের গুলি অবধি গায়ে লাগত না। আর-একজন কুস্তিতে ভারত-বিখ্যাত ছিলেন।

ভাবতে-ভাবতে নবীন এমন বিভোর হয়ে গিয়েছিল যে, মশার কামড় অবধি টের পাচ্ছিল না।

হঠাৎ বাতাসে একটা গুনগুন ধ্বনির মতো কী একটা শোনা গেল। নবীন চোখ বুজে ছিল।

কে যেন বলল, "তাকাও! তাকাও! ওপরে-নীচে, ডাইনে-বাঁয়ে, সামনে-পিছনে।"

নবীন চমকে উঠল।

"কে?"

না, কেউ নেই।

মহাদেব এসে ডাকল, "কী গো দাদাবাবু, আজ কি বাগানেই রাতটা কাটাবে নাকি? ঠাণ্ডা পড়েছে না? এই শীতে এখানে বসে কোন্ খোয়াব দেখছ শুনি? পিসিঠাকরুণ যে ডেকে-ডেকে হয়রান!"

নবীন তাড়াতাড়ি মহাদেবের হাত চেপে ধরে বলল, 'মহাদেবদা, আমি এইমাত্র কার যেন কথা শুনলাম।"

"তোমার মাথাটাই গেছে। ওঠো তো, ঘরে চলো।"

নবীন উঠল। তার মনে হচ্ছিল, সে ভুল শোনেনি। পাতালঘরেও আজ সে কার যেন গলা শুনতে পেয়েছে। কে যেন বলছিল, "ওভাবে নয়।"

নবীন ঘরে এসে গরম চাদরটা গায়ে দিয়ে বেরিয়ে পড়ল। এ-সময়টায় সে লাইব্রেরিতে গিয়ে বইপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করে।

রাস্তায় পা দিতেই একটা ধাক্কা খেয়ে পড়ে গেল নবীন। একেবারে পপাত ধরণীতলে। টের পেল, তার সঙ্গে-সঙ্গে আরও দুটি প্রাণী তারই মতো ছিটকে পড়ে গেছে মাটিতে।

নবীন তাড়াতাড়ি উঠে দু'জনকে ধরে তুলল। দেখল, সদাশিববাবুর নাতি আর নাতনি, বিলু আর অনু।

দু'জনেরই অবস্থা কাহিল। শীতে, ভয়ে দু'জনেই কাঁপছে থরথর করে।

"অনু! বিলু! তোমাদের কী হয়েছে? কোথা থেকে ছুটে আসছ?"

বিলু বলল, "বাঘ!"

"বাঘ! এখানে বাঘ কোথায়? কী হয়েছে বলো তো! তার আগে এসো, ঘরে বসবে। আগে একটু বিশ্রাম নাও। তার পর কথা।"

অনু মাথা নেড়ে বলল, "অত সময় নেই। সিদ্ধিনাথকে কে যেন জঙ্গলের মধ্যে মাথায় ডাণ্ডা মেরে ফেলে রেখে গেছে। তাকে এখনই হাসপাতালে দিতে হবে।"

এ-কথায় নবীন ভারী চমকে উঠল। সিদ্ধিনাথকে কে মারবে? সাতে নেই, পাঁচে নেই!

নবীন বলল, "চলো, তোমাদের বাড়ি অবধি এগিয়ে দিয়ে আসি। লোজন নিয়ে আমিই যাচ্ছি জঙ্গলে। কোথায় ঘটনাটা ঘটেছে বলো তো!"

"কালীবাড়িতে। ভুজঙ্গদা পাহারা দিচ্ছে।"

অনু আর বিলুকে তাদের বাড়ির ফটক অবধি এগিয়ে দিল নবীন। তার পর লোকজন নিয়ে রওনা হল।

কালীবাড়িতে সিদ্ধিনাথ কেন গেল, সেইটেই বুঝতে পারছিল না নবীন। ও দিকে সচরাচর কেটেরহাটের লোকেরা যায় না। বাঘের কথাটাতেও তার ধন্ধ লাগছে। এ-অঞ্চলে একসময়ে বাঘ আসত ঠিকই, কিন্তু আজকাল আর বাঘের কথা শোনা যায় না।

কালীবাড়ির কাছ বরাবর পৌঁছে নবীন ডাকল, "ভুজঙ্গদা! ভুজঙ্গদা! কোথায় তুমি?"

কোনও জবাব পাওয়া গেল না।

তিন-চারটে টর্চের আলোয় চার দিকটা আলোকিত করে সবাই খুঁজছে।

অবশেষে কে একজন চেঁচিয়ে বলল, "এই তো সিদ্ধিনাথ! ইশ্, এ তো প্রায় হয়ে গেছে।"

সবাই দৌড়ে গিয়ে সিদ্ধিনাথকে দেখল। মাথার পিছনে গভীর ক্ষত। চার দিকে রক্ত জমাট বেঁধেছে বটে, কিন্তু এখনও ফোঁটা-ফোঁটা রক্ত পড়ছে। শ্বাস ক্ষীণ।

নবীন নাড়ি দেখল। সে একটু-আধটু ডাক্তারি জানে। বহুকাল যতীন হোমিওপ্যাথের সাগরেদি করেছে। নানা জায়গায় ঘুরে বেড়াতে হয় বলে এবং বিদেশ বিভুঁয়ে অসুখ-বিসুখে বিপদে পড়তে হয় বলে, একটু সে শিখে রেখেছে।

পকেটে ওষুধ সে নিয়েই এসেছিল। সিদ্ধিনাথের মুখে চারটে বড়ি গুঁজে দিল সে। মাথাটা ব্যান্ডেজ করে দিল। তার পর বলল, "বাঁশ কেটে একটা মাচান তৈরি করে ফ্যালো চটপট।"

চার দিকে মেলা বাঁশগাছ। মাচান তৈরি হতে কয়েক মিনিট লাগবে।

নবীন নাড়ি ধরে বসে রইল। তার পর মুখ তুলে জিজ্ঞেস করল, "কিন্তু ভুজঙ্গ কোথায়? সে তো পাহারায় ছিল।"

পানু বলল, "না, তাকে দেখা যাচ্ছে না। বোধহয় ভয় পেয়ে পালিয়েছে।"

ভয় পেয়ে পালানোর লোক ভুজঙ্গ নয়, নবীন জানে। ভুজঙ্গ সার্কাসের দলে ছিল। ট্র্যাপিজের খেলা দেখাত। ভয় থাকলে ট্র্যাপিজের খেলা দেখাতে কেউ পারে?

নবীন মাথা নেড়ে বলল, "পালায়নি। হয় কাউকে তাড়া করেছে, নয়তো তারও সিদ্ধিনাথের মতো দশা হয়েছে। তোমরা কেউ এখানে ব'সো, আমি দেখছি। আমার জন্য অপেক্ষা করার দরকার নেই। ফিরতে দেরি হবে। তোমরা মাচান তৈরি হলে সিদ্ধিনাথকে নিয়ে চলে যেও। ঘন্টাখানেকের মধ্যেই এখানে ফিরে এসো।"

নবীনের ভয়-ডর বলে কিছু নেই। দেশভ্রমণ করতে গিয়ে সে বহু বার বহু রকম বিপদে পড়েছে।

টর্চ আর একটা লাঠি হাতে সে একা বেরিয়ে পড়ল ভুজঙ্গকে খুঁজতে।

চার দিকেই নিবিড় বাঁশবন। ঝোপঝাড়। খানাখন্দ। চার হাত দূরের জিনিসও কুয়াশার জন্য ভাল দেখা যাচ্ছে না। নবীন মাঝে-মাঝে ভুজঙ্গর নাম ধরে ডাকতে ডাকতে খুঁজে বেড়াতে লাগল।

শিমুল গাছের পিছনে এক সময়ে কালীবাড়ির টলটলে দিঘি ছিল। মজে-মজে এখন আর দিঘির অস্তিত্ব নেই। শুকননা একটা খাদ মাত্র। তার ভিতরে মাথা-সমান আগাছার জঙ্গল।

নবীন একবার ভাবল, নামবে না। টর্চ জ্বেলে সে দেখছিল দিঘির ধারে ভেজা মাটিতে মানুষের পায়ের দাগ আছে কি না।

হঠাৎ নবীনকে আপাদমস্তক চমকে দিয়ে একটা বাঘ হুঙ্কার দিয়ে উঠল। এত কাছে যে, মনে হল, এক্ষুনি ঘাড়ে লাফিয়ে পড়বে।

নবীন প্রথমটায় কেমন বিহ্বল হয়ে গেলেও কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে সামলে নিল। যদি ডাকটা সত্যিই বাঘের হয়ে থাকে, তবে তা বিশাল বাঘ। রয়েল বেঙ্গল টাইগার। আর না হলে কেউ বাঘের গলা নকল করে ডাকছে।

দ্বিতীয় সন্দেহটাই নবীনের দৃঢ়মূল হল। সিদ্ধিনাথকে যে বা যারা মেরেছে, তারাই নয় তো?

নবীন টর্চটা নিবিয়ে দিল। বাঘের ডাকটা শোনা গেছে পিছন থেকে। সুতরাং সামনে এগোতে বাধা নেই।

সামনে খাদ।

গুড়ি মেরে নবীন খাদের মধ্যে আগাছার জঙ্গলে নেমে গেল। সাবধানে হাত আড়াল করে টর্চ জ্বেলে সে দেখে নিচ্ছিল, জায়গাটা কতদূর বিপজ্জনক।

হঠাৎ নজরে পড়ল, একজোড়া পা একটা ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে আছে।

নবীন এগিয়ে গেল, টর্চ জ্বেলে দেখল, ভুজঙ্গদাই।

নাকের কাছে হাত রাখল নবীন। শ্বাস চলছে। নাড়ি ধরে দেখল, আঘাত গুরুতর হলেও মারাত্মক নয়।

তার পর লক্ষ করল, ভুজঙ্গেরও মাথার পিছনে বেশ বড়সড় চোট। রক্তে মাটি ভেসে যাচ্ছে।

ব্যাণ্ডেজ পকেটেই ছিল। ওষুধ দিয়ে জায়গাটা বেঁধে দিল সে। তার পর চারটে বড়ি খাওয়াল।

দশ মিনিটের মধ্যেই ভুজঙ্গ চোখ মেলে চাইল।

“ভুজঙ্গদা।”

“কে?”

“আমি নবীন। এখন কেমন লাগছে?”

ভুজঙ্গ যন্ত্রণায় মুখটা বিকৃত করে বলল, “আমাকে ধরে তোলো তো।”

“চলতে পারবে?”

“পারব।”

নবীন তাকে ধরে বসাল।

“কী হয়েছিল ভুজঙ্গদা?”

ভুজঙ্গ ঠোঁট উল্টে বলল, “কী করে বলব? সিদ্ধিনাথকে পাহারা দিচ্ছিলাম। হঠাৎ কাছে-পিঠে একটা বাঘ ডেকে উঠল। প্রথমটায় একটু ঘাবড়ে গিয়েছিলাম ঠিকই। কিন্তু সার্কাসে মেলা বাঘ-সিংহ দেখেছি, দিন রাত তাদের ডাক শুনেছি। কেমন যেন মনে হল, এ সাচ্চা বাঘের ডাক নয়।”

“বটে! তোমারও তাই মনে হল?”

“তুমিও শুনেছ নাকি?”

“শুনেছি, আমারও মনে হয়েছে, ওটা আসল বাঘের ডাক নয়। তোমার ঘটনাটা আগে বলো।”

“বাঘের ডাকটা নকল বলে মনে হতেই আমি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলাম। চার দিক সুনসান। হঠাৎ শুনলাম, ঝোপঝাড় ভেঙে কে যেন চলে যাচ্ছে। মনে হল, একটা বেশ লম্বা চেহারার লোক বাঁশবনের মধ্যে সেঁধিয়ে গেল। তাড়াতাড়ি পিছু নিলাম। লোকটাকে আর দেখতে পাচ্ছিলাম না। এক জায়গায় দাঁড়িয়ে ভাবছি, কোন দিকে যাব—হঠাৎ আবার সেই বাঘের ডাক। এই দিক থেকেই হল। দৌড়ে এলাম। তখন আচমকা কে যে পিছন থেকে মাথায় মারল, কিছু বুঝতে পারলাম না।”

নবীন চিন্তিতভাবে বলল, “তোমার কিছু সন্দেহ হয়?”

ভুজঙ্গ মাথা নেড়ে বলল, “শুধু মনে হচ্ছে কোনও পাজি লোক কেটেরহাটে এসে জুটেছে। সিদ্ধিনাথকে নইলে মারবে কে, বলো? তার টাকা-পয়সা নেই, সম্পত্তি নেই।”

নবীন একটু হেসে বলল, “তা না থাক, তবে সিদ্ধিনাথ হয়তো গুপ্ত কোনও খবর রাখে, যা আমি বা তুমি জানি না।”

“কী জানি বাপু!”

“তুমি হাঁটতে পারবে ভুজঙ্গদা?”

“পারব।”

“তা হলে আমার কাঁধে ভর দিয়ে চলো। অনেকটা পথ।”

“পারব হে নবীন। ভুজঙ্গ সার্কাসে খেলা দেখাত। সে ফুলের ঘায়ে মূর্ছা যায় না।”

দু’জনে এগোতে লাগল।
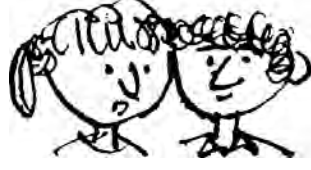
ভোর রাতে সিদ্ধিনাথের খুব জ্বর এল। সে ভুল বকতে শুরু করল।

হেলথ্ সেন্টারে চিকিৎসার ব্যবস্থা খুব ভাল নয়। তবে ডাক্তার লোক ভাল। নিজের ঘর থেকে ওষুধপত্র এনে দিলেন। কেটেরহাটের মেলা-লোক রাত জেগে বসে রইল বাইরে, এই সাঙ্ঘাতিক শীতের মধ্যেও।

ভোরবেলা ডাক্তার এসে নবীনকে বললেন, "সিদ্ধিনাথের অবস্থা ভাল নয়। বিকারের মধ্যে সে কিছু বলছে। কথাগুলো আপনি এসে একটু শুনুন।"

নবীন গিয়ে দেখল, সিদ্ধিনাথ চিত হয়ে পড়ে আছে। মুখখানা নীলবর্ণ। মাঝে-মাঝে অস্ফুট 'উঃ আঃ' করছে। মাঝে-মাঝে কথা বলে উঠছে।

নবীন কাছেই একটা চেয়ার টেনে বসল।

সিদ্ধিনাথ খানিকক্ষণ নিঝুম হয়ে থেকে হঠাৎ বলে উঠল, "নবীনের বাড়ির পশ্চিম কোণ...কালীবাড়ির দক্ষিণে...ওঃ, কী অন্ধকার! বাঘ ডাকছে...বাবা রে! ...ওরা কারা? ...ষাটটা সিঁড়ি আছে... সদাশিবকর্তাকে ব'লো, এরা ভাল লোক নয়..."

নবীন কিছুই বুঝতে পারল না। তবে কথাগুলো মনে রাখল।

সিদ্ধিনাথ ফের বলল, "পাতালঘর...নবীনের পাতালঘর...কেউ ঢুকতে পারবে না..."

নবীন পাতালঘরের কথায় সিদ্ধিনাথের মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ল।

"সিদ্ধিনাথ খুড়ো! কী বলছ?"

সিদ্ধিনাথ আবার জ্ঞান হারিয়ে ফেলল।

নবীন ডাক্তারের দিকে চেয়ে বলল, "কী মনে হচ্ছে ডাক্তারবাবু? বাঁচবে?"

"বাঁচতে পারে। তবে বাহাত্তর ঘণ্টার আগে কিছু বলা যায় না। শুনছি, সদাশিববাবু কলকাতা থেকে ডাক্তার আনাবেন, দেখা যাক, তারা যদি কিছু করতে পারে।"

"কী করে আনাবে?"

"সদাশিববাবুর ঝিলের বাড়িতে কারা ভাড়া এসেছে। তাদের গাড়ি আছে। একজন সেই গাড়ি নিয়ে কলকাতা রওনা হয়ে গেছে।"

নবীন শুনে নিশ্চিন্ত হল।

বেলা আটটা নাগাদ কলকাতার ডাক্তার, ওষুধপত্র, অক্সিজেন সিলিন্ডার, সবই চলে এল। কেটেরহাটের লোকেরা ধন্য-ধন্য করতে লাগল। চাকর-বাকরের জন্য মনিবেরা তো এত করে না। সদাশিববাবু নিজেই ডাক্তারকে সঙ্গে নিয়ে এলেন।

নবীনের দিকে চেয়ে সদাশিব বললেন, "বুঝলে নবীন, সিদ্ধিনাথ আমাদের পরিবারে আছে এইটুকু বয়স থেকে। তার জন্য দু-চার-পাঁচ শো টাকা খরচ করাটা কোনও বিরাট মহত্ত্ব নয়।"

নবীন মাথা নেড়ে বলল, “যে আজ্ঞে। তবে সিদ্ধিনাথের কিছু গোপন খবরও জানা আছে। সেটা বেশ মূল্যবান খবর।”

সদাশিব মৃদু একটু হেসে নবীনের কাঁধে হাত রেখে বললেন, “গোপন খবর মানে কি সেই দিঘির তলায় মন্দির? আরে পাগল! সেটা তো কিংবদন্তি।”

নবীন মাথা নেড়ে বলল, “কিংবদন্তির মধ্যে অনেক সময় সত্য লুকোনো থাকে। সিদ্ধিনাথ নিশ্চয়ই কিছু জানতে পেরেছিল। নইলে কেন ওকে কেউ মারবে, বলুন?”

সদাশিব গম্ভীর হয়ে বললেন, “সেটা ঠিক। তবে যেই মারুক, সে রেহাই পাবে না। আমি পুলিশে খবর দিয়েছি, তারা এল বলে।”

পুলিশের কথায় নবীন খুব নিশ্চিন্ত হল না। কেটেরহাটে থানা নেই। আছে দু' মাইল দূরে। পুলিশ এত দূর থেকে খুব বেশি কিছু করতে পারবে বলে তার মনে হয় না। কিন্তু মুখে সে কিছুই বলল না।

কলকাতার ডাক্তার সিদ্ধিনাথকে পরীক্ষা করে বেরিয়ে এসে বললেন, “লোকটার বয়স হয়েছে বটে, কিন্তু খুব শক্ত ধাতের লোক। “

সদাশিব জিজ্ঞেস করলেন, “বাঁচবে?”

“বাঁচবে বলেই মনে হয়। তবে ভাল হয়ে উঠতে সময় লাগবে। দিন তিনেক একদম কাউকে কাছে যেতে দেবেন না।”

নবীন নিশ্চিন্ত হয়ে বাড়ি এসে নেয়ে-খেয়ে ঘুম দিল। সারা রাত ঘুমোয়নি।

বিকেলে গিয়ে খোঁজ নিয়ে জানল, সিদ্ধিনাথ ঘুমোচ্ছে। একটু ভালর দিকে।

নবীন লাইব্রেরিতে গিয়ে খানিকক্ষণ বই-পত্র নাড়াচাড়া করল। উঠতে যাবে, এমন সময় বিলু এসে হাজির।

“নবীনদা!”

“আরে, বিলু!”

“তোমাকেই খুঁজছি কখন থেকে। চলো, কথা আছে।”

“কী কথা?”

“চলো না, বাইরে দিদি দাঁড়িয়ে আছে।”

নবীন তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এল।

“কী ব্যাপার বলো তো?”

অনু বলল, “নবীনদা, আমরা জঙ্গলের মধ্যে যাব। তোমার সঙ্গে।”

“এই রাত্রে?”

“রাতেই তো যা ঘটবার ঘটে।”

“কিন্তু সদাশিববাবু শুনলে যে রাগ করবেন।”

“করবেন না। আমরা যাত্রা শুনবার নাম করে বেরিয়েছি। ভুজঙ্গদা সঙ্গে যাবে।”

নবীন তবু দোনোমোনো করে বলল, “ও জায়গাটা ভাল নয় যে! তোমরা ছেলেমানুষ। যাওয়াটা ঠিক হবে না।”

অনু তার গায়ের ওভারকোটটা খুলে পিঠ থেকে স্লিং-এ ঝোলানো একটা বন্দুক বের করে বলল, "দেখেছ? আমি বন্দুক ভালই চালাতে পারি। আমি কাউকে ভয়ও পাই না। তবে বিলুটা একটু ভিতু।"

বিলু সঙ্গে-সঙ্গে দিদির হাত খিমচে ধরে বলল, "আরশোলা দেখে তোর মতো কি আমি চেঁচাই?"

নবীন বন্দুক দেখে বেশ ঘাবড়ে গেল। অনু বাচ্চা মেয়ে, তার কাছে বন্দুক থাকাটা সমীচীন নয়। সদাশিববাবু যদি জানতে পারেন যে, এই ঘটনাকে নবীন প্রশ্রয় দিয়েছে, তা হলে ভীষণ রেগে যাবেন।

নবীন তাই ভালমানুষের মতো বলল, "জঙ্গলে, আজ রাতে গিয়ে লাভও হবে না। পুলিশ সেখানে গিজগিজ করছে। একটু আগে আমাদের মহাদেব দেখে এসেছে কিনা। সারা জঙ্গল বড়-বড় লাইট ফেলে তল্লাসি হচ্ছে। বাইরের কাউকে ঢুকতে দিচ্ছে না।"

সর্বৈব মিথ্যে কথা। তবে কাজ হল। এ-কথায় ভাই-বোন একটু মুষড়ে পড়ল। রহস্যময় নৈশ অভিযান তা হলে তো সম্ভব নয়।

নবীন বলল, "আজ বাড়ি গিয়ে চুপটি করে থাকে। কাল জঙ্গলে যাওয়া যাবে।"

অনু আর বিলু হতাশ গলায় বলল, "আচ্ছা।"

নবীন দু'জনকে বাড়ির পথে খানিকদূর এগিয়ে দিয়ে বাড়ি ফিরে এল।

নবীনের মাথাটা বড্ড এলোমেলো। অল্প সময়ের মধ্যে এত ঘটনা ঘটে যাওয়ায় সে ঠিক তাল রাখতে পারছে না। কিন্তু কেটেরহাটের নিস্তরঙ্গ জীবনে যে হঠাৎ একটা বড় রকমের ঘটনা ঘটতে চলেছে, তার আভাস পাওয়া যাচ্ছে।

নবীন তাদের এগিয়ে দিয়ে ফিরে যাওয়ার পরই বিলু আর অনু দাঁড়িয়ে পড়ল।

অনু বলল, "দ্যাখ বিলু, আমার মনে হল, নবীনদা আমাদের ভাগিয়ে দেওয়ার জন্যই পুলিশের কথাটা বানিয়ে বলল।"

"আমারও ঠিক তাই মনে হচ্ছে রে দিদি। বড়রা তো এ রকমই হয়, ছোটদের পাত্তা দিতে চায় না।"

"তা হলে আমাদের কী করা উচিত? নবীনদাকে বাদ দিয়েই যাব কি না ভাবছি। শুধু ভুজঙ্গদা সঙ্গে থাকবে।"

বিলু মাথা নেড়ে বলল, "ভুজঙ্গদা রাজি হয়েছে বটে, কিন্তু শেষ অবধি ভুজুং-ভাজাং দিয়ে যাওয়া আটকে দেবে।"

অনু একটু ভেবে নিয়ে বলল, "ঠিকই বলেছিস। ভুজঙ্গদা কেমন যেন 'আচ্ছা-আচ্ছা-হবে-হবে' বলে এড়ানোর চেষ্টা করছিল। তা হলে কী করা উচিত?

"তুই আর আমি মিলে যাই, চল।"

"তোর ভয় করবে না তো?"

"না। আমাদের তো বন্দুক আছে। ভয় কী?"

অনু রাস্তাটা ভাল করে দেখে নিল। কেউ নেই। কেটেরহাটে এমনিতেই লোকজন কম। তার ওপর এবারকার সাঙ্ঘাতিক শীতে বিকেলের পর আর রাস্তা-ঘাটে বিশেষ লোক থাকে না।

অনু বলল, "তা হলে চল।"

দুই ভাই-বোন অতি দ্রুত আবার উলটো দিকে হাঁটতে লাগল। একটু বাদেই ঝিলের ধার ঘেঁষে তারা জঙ্গলের পথে পা দিল।

"দিদি! বাঘটা তো আসল বাঘ নয়! না?"

"না।"

"ঠিক তো?"

"তাই তো ভুজঙ্গদা বলছে। ভুজঙ্গদা সার্কাসে ছিল, বাঘের ডাক ভালই চেনে। তোর কি ভয় করছে?"

"না তো! ভয় কী? বন্দুক আছে না?"

অনু একটু হেসে বিলুর হাতটা চেপে ধরে বলল, "বাঘ হলেই বা কী? আমি ভয় পাই না।"

"আমিও না।"

জঙ্গলের মধ্যে নিবিড় অন্ধকার। ঢুকবার আগে দু'জনে একটু দাঁড়াল। পরস্পরের দিকে একটু তাকাল। তার পর দু'জনে দু'জনের হাত ধরে ঘেঁষাঘেঁষি হয়ে জঙ্গলের ভিতরে ঢুকল।

প্রথমটায় পথ দেখা যাচ্ছিল না। মাঝে-মাঝে টর্চ জ্বালতে হচ্ছিল।

অনু বলল, "টর্চ জ্বালাটা ভাল হচ্ছে না। যদি পাজি লোক কেউ থেকে থাকে এখানে, তবে সে, টের পেয়ে যাবে।"

"অন্ধকারে কী করে হাঁটবি?"

"একটু দাঁড়িয়ে থাকলে ধীরে-ধীরে চোখে অন্ধকার সয়ে যাবে।"

দু'জনে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল চুপচাপ। ক্রমে-ক্রমে চার দিককার নিবিড় জঙ্গল তাদের চোখে আবছা ফুটে উঠতে লাগল।

"এবার চল।"

অনু আর বিলু এগোতে লাগল।

হঠাৎ বিলু চাপা গলায় বলল, "দিদি!"

"কী রে?"

"কিছু দেখলি?"

"না তো! তুই দেখলি?"

"বাঁশবনের মধ্যে একটা ছায়া সরে গেল যেন!"

"ও কিছু নয়, শেয়াল।"

মুখে 'শেয়াল' বললেও অনু চার দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিল। কী তারা খুঁজতে বা জানতে এসেছে, তা তারা নিজেরাও ভাল জানে না।

অনু ভাইয়ের হাতটা শক্ত করে চেপে ধরে ফিসফিস করে বলল, "কালীবাড়ি আর বেশি দূরে নয়। সাবধানে আয়। কোনও শব্দ করিস না।"

আরও মিনিট কয়েক নিঃশব্দে হাঁটার পর অনু বলল, "দাঁড়া।"

"কেন রে দিদি?"

"মনে হচ্ছে অন্ধকারে রাস্তা হারিয়ে ফেলেছি।"

“তা হলে কী হবে?”

অনু বলল, “ভয় পায় না। বিপদে ভয় পেলে বিপদ আরও বাড়ে। চল এগোই। রাস্তা ঠিক পেয়ে যাব।”

অনু তার কব্‌জির ঘড়িটা দেখল। উজ্জ্বল ডায়াল, অন্ধকারেও সময় বুঝতে অসুবিধে নেই। রাত মোটে পৌনে ন'টা বাজে। কিন্তু জঙ্গলের মধ্যে মনে হচ্ছে নিশুত রাত।

দু'জনে এগোতে লাগল। এবং কিছুক্ষণ পরেই বুঝতে পারল, তাদের পায়ের নীচের সুঁড়ি-পথটা আর নেই। তারা ঝোপ-ঝাড়ের মধ্যে বিপথে এসে পড়েছে।

অনু টর্চটা জ্বালাল, তার পর বলল, “আমরা পথ হারিয়ে ফেলেছি!”

“চল, ফিরে যাই।”

“ফিরে যাওয়ার পথটাও তো খুঁজতে হবে। তার চেয়ে চল, এগোতে থাকি। এক সময়ে জঙ্গল শেষ হয়ে যাবে।”

“চল।”

দু'জনে সম্পূর্ণ আন্দাজে হাঁটতে লাগল। পায়ের নীচে লতা-পাতা, চার দিকে ঝোপঝাড়, মাঝে-মধ্যে বাঁশবন, বড়-বড় গাছের জড়াজড়ি।

“কোথায় যাচ্ছি রে দিদি?”

“চল না?”

“জঙ্গলটা কত বড়?”

“বেশ বড় বলেই শুনেছি। সুন্দরবনে গিয়ে মিশেছে।”

“ও বাবা!”

অনু পিঠ থেকে বন্দুকটা খুলে হাতে নিল। তার পর বলল, “ভিতু কোথাকার! তোকে না-আনলেই হত।”

“মোটেই ভয় পাইনি। চল্‌ না! আমার পকেটে গুলতি আছে।”

দু'জনে হাঁটতে হাঁটতে যত এগোচ্ছে, তত জঙ্গল গভীর আর ঘন হচ্ছে। ঘাস-ঝোপ প্রায় বুক-সমান উঁচু। লতা-পাতায় বারবার পা আটকাচ্ছে। দুবার পড়ে গেল বিলু। তেমন চোট লাগল না অবশ্য। অনু পড়ল একবার।

“দিদি, খরগোশ না?”

“খরগোশ আছে, শেয়াল আছে, শজারু আছে। ওগুলো কিছু করবে না।”

“জানি।”

ক্রমে-ক্রমে চলাটাই অসম্ভব হয়ে পড়তে লাগল। এতক্ষণ কাঁটাঝোপের বাড়াবাড়ি ছিল না। কিন্তু এবার কাঁটাঝোপ পথ আটকাতে লাগল।

দু'জনের গায়েই পুরু গরমজামা আর মাথায় কান-ঢাকা টুপি থাকায় তেমন আঁচড় লাগেনি, কিন্তু এগোতে বাধা হচ্ছিল।

“কী করবি দিদি?”

অনু তার ওভারকোটের পকেট থেকে একটা বড় ফোল্ডিং ছুরি বের করে তাই দিয়ে সামনের পথ পরিষ্কার করতে করতে বলল, “এগিয়ে যাব।”

"কিন্তু কালীবাড়ি?"

"দেখাই যাক না।"

ঘাসবন ক্রমে উঁচু হতে-হতে তাদের মাথা ছাড়িয়ে গেল। কাঁটাঝোপ এত নিবিড় হল যে, আর এগোনোই যায় না। এদিকে বিলুর ভীষণ জলতেষ্টা পেয়েছে। একটু খিদেও পাচ্ছে।

"দিদি?"

অনু দাঁতে দাঁত চেপে বলল, "যারা নতুন দেশ আবিষ্কার করেছে, যারা বড়-বড় পাহাড়ে উঠেছে, যারা মরুভূমি পার হয়, যারা যুদ্ধ করে, তারা এর চেয়েও লক্ষ গুণ বেশি কষ্ট করে, তা জানিস?"

"জানি।"

"ভয় নেই, আমি যতক্ষণ সঙ্গে আছি, ততক্ষণ কেউ তোর কিছু করতে পারবে না। খিদে-তেষ্টা একটু সহ্য কর।"

"রাত বাড়লে যে ঘুম পাবে।"

"তখন আমার কোলে শুয়ে ঘুমোস।"

"হুঁ! তোর কোলে শোব কেন? আমি কি কচি খোকা?"

"তা হলে কচি খোকার মতো 'তেষ্টা পেয়েছে, খিদে পেয়েছে' করছিস কেন? আমার তো পথ হারিয়ে বেশ মজাই লাগছে। কলকাতায় কি এ রকম অ্যাডভেঞ্চার হয়?"

বিলু সভয়ে চার দিক চেয়ে দেখল। এখানে জঙ্গল এত নিবিড় যে, আকাশ একটুও দেখা যায় না। চারদিকে ভুতুড়ে নির্জনতা। টর্চের আলো ছাড়া এগোনো অসম্ভব। কিন্তু টর্চের আলো ক্রমে ফুরিয়ে আসছে। এর মধ্যেই আলোটা লাল আর ম্যাড়মেড়ে হয়ে গেছে।

অনু হঠাৎ বলল, "অনেকক্ষণ হেঁটেছি। আয়, দু'জনে বসে একটু জিরিয়ে নিই।"

এ-কথায় বিলু খুশি হল। তার আর এই দুর্ভেদ্য জঙ্গলে হাঁটতে ইচ্ছে করছিল না। অন্ধকারেই সে টের পাচ্ছিল, হাতের দস্তানা ছিঁড়ে গেছে কাঁটায়, আঙুলও ছড়ে গিয়ে জ্বালা করছে। গায়ে আঁচড় লেগেছে।

"কোথায় বসবি?"

"ওই যে গাছটা দেখা যাচ্ছে, আয়, ওর তলায় বসি।"

মস্ত গাছ। টর্চের আলো ফেলে অনু দেখল, বটগাছ। চার দিকে অজস্র ঝুরি নেমে গাছটা নিজেই জঙ্গল হয়ে আছে।

দু'জনে ধীরে-ধীরে গাছটার কাছে এগোতে লাগল। আশ্চর্যের বিষয়, গাছটার চারধারে ঝোপ-ঝাড় বিশেষ নেই।

অনু টর্চ জ্বেলে অবাক হয়ে দেখল, বটগাছের তলাটায় তত জঙ্গল নেই, আর মূল কাণ্ডের চার-দিকটা বড়-বড় চৌকো পাথর দিয়ে বাঁধানো।

অনু বলল, "বাঃ, এখানে শোওয়াও যাবে রে।"

বিলু পাথরের ওপর শোওয়ার প্রস্তাবে তেমন খুশি হল না। কিন্তু একটু বসতে পাবে, এটাই যা আনন্দের কথা।

দু'জনে পাথরের বেদীতে পাশাপাশি বসল। অনু টর্চ জ্বেলে চারদিকটা দেখতে লাগল।

“এ জায়গাটা কী ছিল বল তো বিলু?”

“জানি না তো!”

“আন্দাজ করতে পারিস না?”

“না। খিদে পেলে আমার মাথাটা একদম কাজ করতে চায় না।”

অনু উঠে চার দিকটায় আলো ফেলে ঘুরে-ঘুরে দেখল। তার পর বিলুর পাশে এসে বসে বলল, “এখানে বহুকাল আগে লোকের আনাগোনা ছিল। একটা মস্ত ইঁদারার মুখ দেখলাম! তাতে আবার সিঁড়ি লাগানো। মনে হয়, ওটা ফাঁসি দেওয়ার কুয়ো।”

বিলু ভয় খেয়ে বলল, “ফাঁসি?”

অনু মাথা নেড়ে বলল, “আমাদের পূর্বপুরুষেরা ডাকাত ছিল জানিস তো! দাদুর কাছে শুনেছি, তারা বিশ্বাসঘাতকদের ধরে জঙ্গলের মধ্যে নিয়ে গিয়ে বিচার করত। তার পর ফাঁসি দিত।”

বিলু বলল, “ও বাবা!”

অনু আর বিলু খানিকক্ষণ জিরোল। তার পর অনু বলল, এভাবে রাতটা কাটিয়ে দিবি নাকি রে, বিলু?”

“একটু ভয়-ভয় করছে রে, দিদি।”

“তা হলে আয়, চার দিকটা ভাল করে দেখি। ওই কুয়োটা আমার আর-একটু ভাল করে দেখার ইচ্ছে।”

“তোর সাঙ্ঘাতিক সাহস!”

“বিপদে না পড়লে মানুষের সাহস হয় না। আমার সব ভয়-ডর কেটে গেছে। আয় আমার সঙ্গে।”

“কুয়োর মধ্যে কী আছে?”

“জানি না। তবে ভিতরে কুয়োর গা বেয়ে অনেক দূর পর্যন্ত সিঁড়ি নেমে গেছে। কেন, তা দেখতে হবে।”

অনুর পিছু-পিছু বিলু এগোতে লাগল। ঝোপঝাড়ের ভিতর দিয়ে খানিকটা এগোতেই কুয়োটা দেখা গেল। এই জায়গায় বহুকাল লোক-জন আসেনি, বোঝাই যায়। ইটে বাঁধানো কুয়োটা বেশ খানিকটা উঁচু। কুয়োর ওপর এক সময়ে হয়তো ফাঁসির মঞ্চ ছিল। দু' ধারে দুটো ভাঙা থাম আজও দাঁড়িয়ে আছে। কুয়োর ধারে উঠবার সিঁড়িও আছে। তবে তা ভাঙাচোরা।

দু' ভাই-বোনে কুয়োটার চার পাশ ঘুরে দেখল।

“দিদি! এখন কী করবি?”

“আয়, ওপরে উঠব।”

সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে তাদের বেশি কষ্ট হল না। কুয়োর ভিতরে এত আগাছা জন্মেছে যে, সেই সব গাছপালার ডগা ওপর পর্যন্ত উঠে এসেছে। নীচে অন্ধকার। গাছপালার ফাঁক দিয়ে খুব সরু সিঁড়ির ধাপ নীচে নেমে গেছে।

“এর মধ্যে নামতে চাস দিদি? কিন্তু রেলিং নেই যে!”

“তাতে কী হল। ঠিক নামতে পারব। পড়ে গেলে ব্যথা লাগবে না, গাছপালায় আটকে যাব।”

অনু আগে, পিছনে বিলু। সাবধানে দুই ভাই-বোনে কুয়োর মধ্যে নামতে লাগল। ভারী মজার সিঁড়ি, কুয়োর চার পাশে ঘুরে-ঘুরে নেমে গেছে।

বিলুর প্রথমটায় পড়ে যাওয়ার ভয় হচ্ছিল। কারণ সিঁড়ির ধাপ এক ফুট চওড়া নয়, কিন্তু নামতে গিয়ে দেখল, দিদির কথাই ঠিক। গাছপালাগুলোই দিব্যি রেলিঙের মতো কাজ করছে।

নামতে-নামতে এক সময়ে বিলু ওপর দিকে তাকিয়ে দেখল।

"দিদি!"

"কী রে?"

"ওপরটা যে দেখা যাচ্ছে না। আমরা কোথায় নামলাম?"

"ভয় নেই। ওপরটা গাছপালার আড়ালে পড়েছে।"

এক সময়ে হঠাৎ থেমে গিয়ে অনু বলল, "বিলু! আর যে সিঁড়ি নেই!"

"তার মানে?"

"সিঁড়ি ভেঙে গেছে।"

"তা হলো?"

অনু একটু ভাবল। তার পর বলল, "গাছ বেয়ে নামতে পারবি? এখানে বেশ মোটা-মোটা লতাপাতা আছে।"

"তার চেয়ে ফিরে যাই চল।"

অনু একদম শেষ ধাপটায় দাঁড়িয়ে ছিল। হঠাৎ সে একটা অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠল, "মা গো!"

জরাজীর্ণ সিঁড়ির শেষ ধাপটা অনুর ভার সইতে না পেরে হঠাৎ হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ে গেল নীচে।

বিলু অন্ধকারে বিহ্বল হয়ে কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থেকে হঠাৎ বুক-ফাটা ডাক দিল, "দিদি!"

তলা থেকে কোনও জবাব এল না।

বিলু প্রথমটা ভীষণ ঘাবড়ে গেলেও বুঝতে পারল, এ-সময়ে ঠাণ্ডা মাথায় কাজ না করলে দিদিকে বাঁচানো যাবে না।

তার কাছে টর্চ নেই। সুতরাং নীচের দিকটা সে কিছুই দেখতে পাচ্ছিল না। তার চার দিকেই ঘন অন্ধকার।

বিলু বার-কয়েক ডাকল, "দিদি! এই দিদি! শুনতে পাচ্ছিস?"

কেউ জবাব দিল না।

বিলুর চোখ ফেটে কান্না এল। দিদিকে সে ভীষণ ভালবাসে। দিদির যদি কিছু হয়, তা হলে সে থাকবে কী করে?

বিলু হাত বুড়িয়ে খুঁজতে-খুঁজতে একটা মোটা লতা নাগালে পেয়ে গেল। খুব ধীরে ধীরে লতাটা ধরে সে নামতে লাগল নীচে।

কাজটা খুব সহজ হল না। লতাপাতায় এতই নিশ্চিদ্র হয়ে আছে তলার দিকটা যে, তার হাত-পা ছড়ে যাচ্ছিল। মাঝে-মাঝে আটকে পড়ছিল সে। সে টারজান, অরণ্যদেব, টিনটিন এবং এই রকম সব বীরপুরুষদের কথা ভাবতে লাগল প্রাণপণে। এরা তো কতই শক্ত কাজ করে, তাই না?

আচমকাই বিলুর ধরে থাকা লতাটা হড়াস করে আলগা হয়ে গেল।

অন্ধকারে কী থেকে যে কী হয়ে গেল! ঝোপঝাড়, লতাপাতা ভেদ করে বিলু পড়ে যেতে লাগল। একেবারে অসহায়ের মতো।

“বাবা গো!”

তারপর ঝপ করে কিছুর ওপর আছড়ে পড়ল সে। মাথাটা ঘুরে গেল। চোখ অন্ধকার হয়ে গেল তার।
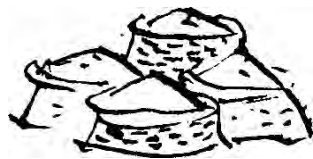
সদাশিববাবুর নাতি আর নাতনিকে বাড়িতে ফেরত পাঠিয়েও নবীন স্বস্তি পাচ্ছিল না। অনু আর বিলুকে সে খানিকটা চেনে। দু’জনেই ভারী একগুঁয়ে আর জেদি। সদাশিববাবুরই তো নাতি আর নাতনি। তার ওপর ওদের শরীরেও ডাকাতের রক্ত আছে।

সুতরাং নবীন ফের সদাশিববাবুর বাড়ির দিকে ফিরল। কথাটা সদাশিববাবুকে জামানো দরকার।

সদাশিববাবুর মনটা বিশেষ ভাল নেই। সিদ্ধিনাথের মতো পুরনো আর বিশ্বাসী লোককে এভাবে ঘায়েল করল কে, তা-ই ভেবে তিনি ভীষণ উদ্বেগ বোধ করছেন। বাইরের ঘরে শাল মুড়ি দিয়ে বসে তিনি এই সবই ভাবছিলেন।

নবীনকে দেখে বললেন, “এসো হে নবীনচন্দ্র, কেটেরহাট যে আবার বেশ বিপদের জায়গা হয়ে উঠল।”

“তা-ই দেখছি।”

“ডাকাতের আমলে এখানে খুন-জখম হত বটে, কিন্তু সে তো অতীতের কথা। ইদানীং তো কেটেরহাটের মতো নিরাপদ জায়গা হয় না।”

“যে আজ্ঞে।”

“তা হলে এ সব হচ্ছেটা কী?”

“আমিও ভেবে পাচ্ছি না।”

“তার ওপর বাঘের ডাকও শোনা যাচ্ছে।”

নবীন একটা চেয়ারে বসে বলল, “ব্যাপারটা সবাইকেই ভাবিয়ে তুলেছে সদাশিববাবু। এমনকি, অনু আর বিলু অবধি জঙ্গলে যেতে চাইছে।”

সদাশিববাবু একটু চমকে উঠে বললেন, “জঙ্গলে? খবরদার না। কে ওদের এই বুদ্ধি দিয়েছে?”

“আপনি উত্তেজিত হবেন না। ছেলেমানুষ তো! ভারী অ্যাডভেঞ্চারের শখ। আমি ওদের বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ঠাণ্ডা করেছি। আপনিও একটু নজর রাখবেন, যেন হুট করে বেরিয়ে না পড়ে। বেরোলে বিপদ হতে কতক্ষণ?”

“বটেই তো! ওরে ও বচন, অনু আর বিলুকে ডাক তো। বল, এক্ষুনি আসতে।”

বচন এসে বলল, “ওনারা তো যাত্রা শুনতে গেছেন।

“তাই তো! আমাকে তো বলেই গেছে।”

নবীন একটু অস্বস্তিতে পড়ে বলল, “না, যাত্রা শুনতে যাচ্ছিল বটে, কিন্তু আমি ওদের ফের ফিরিয়ে ফটক অবধি পৌঁছে দিয়ে গেছি। বচন, ভাল করে খুঁজে দ্যাখো তো?”

বচন গিয়ে একটু বাদে এসে বলল, “বাড়িতে নেই।”

সদাশিববাবু উত্তেজনায় উদ্বেগে খাড়া হয়ে উঠলেন, “বলিস কী? বাড়িতে নেই মানে?”

বুদ্ধিমান নবীন অবস্থাটা বুঝে চোখের পলকে সামলে নিল পরিস্থিতিটা। বলল, “আপনি উত্তেজিত হবেন না। যাত্রার লোভ আমি নিজেও সামলাতে পারি না। ও বড় সাঙ্ঘাতিক নেশা। আসলে হল কী জানেন, আমি ওদের যেতে বারণ করলেও ওরা মানতে চাইছিল না। আমার মনে হয়, ওরা ফের যাত্রাতেই গেছে। আমি গিয়ে দেখে আসছি।”

সদাশিব খানিকটা শান্ত হয়ে বসলেন। বললেন, “সেটাই সম্ভব। তবু বচনকে সঙ্গে নিয়ে যাও। খবরটা না পেলে আমার হার্ট ফেল হয়ে যাবে।”

নবীন বেরিয়ে এসে বচনকে আড়ালে নিয়ে বলল, “দ্যাখো, ব্যাপারটা একটু গোলমেলে ঠেকছে। তুমি যাত্রার আসরটা দেখে এসো তো! কিন্তু যদি সেখানে ওদের না দেখতে পাও, তবে কর্তাবাবুকে এসে সেই খবরটা দিও না। ব'লো, ওরা যাত্রা দেখছে। আমি একটু জঙ্গলটা খুঁজে আসছি।”

নবীন বাড়ি ফিরে তার টর্চ-বাতিটা আর লাঠিগাছ সঙ্গে নিল। লাঠিটা বোধহয় দু'শো বছরের পুরনো। শোনা যায়, এই লাঠি তার কোনও পূর্বপুরুষ ব্যবহার করতেন। প্রতিটা গাঁট পেতল দিয়ে বাঁধানো। মহাদেব আজও এটাকে খুব পরিচর্যা করে বলে এখনও মজবুত আর তেল-চুকচুকে আছে। গায়ের চাদর ছেড়ে নবীন একটা ফুলহাতা সোয়েটার আর বাঁদুরে টুপি পরে নিল। ধুতির বদলে পরল প্যান্ট। পায়ে বুট জুতো।

তার পর বেরিয়ে পড়ল।

জঙ্গলের মধ্যে স্বাভাবিক পথে ঢুকে কোনও লাভ নেই। অনেকটা ঘুরতে হবে। নবীনের একটা শর্টকাট জানা আছে। ঝিলের পশ্চিম ধার দিয়ে গেলে জঙ্গলের কালীবাড়ি কাছেই হয়।

নবীন সেই পথই ধরল। আসলে পথ বলে কিছু নেই। ঝোপঝাড় ভেদ করেই হাঁটতে হয়। তবে দিনের বেলা এখান দিয়ে কিছু লোক কাঠ কুড়োতে যায়। গরিবেরা আসে জঙ্গলের ফল-পাকুড় পাড়তে। দুষ্টু ছেলেদেরও আনাগোনা আছে। তাই সামান্য একটু পথের চিহ্নও আছে।

নবীন দ্রুত সেই পথ ধরে এগোতে লাগল।

তার পথ ভুল হওয়ার ভয় নেই। অল্প সময়ের মধ্যেই সে কালীবাড়ির কাছে পৌঁছে গেল। চার দিক অন্ধকারে ডুবে আছে। শেয়াল ডাকছে। ঝিঁঝিঁ ডাকছে। পেঁচা ডাকছে।

নবীন চার দিকটা সতর্ক পায়ে ঘুরে দেখল। কোথাও অনু বা বিলুর কোনও চিহ্ন নেই। নবীন এই জায়গায় দিনে-দুপুরে বহু বার এসেছে। ছেলেবেলা থেকেই এই জায়গা তার চেনা। মাঝে-মধ্যে এক সাধু এসে এখানে থানা গাড়তেন। ফের কিছু দিন পর চলে যেতেন। তাঁর নাম অঘোরবাবা। লোকে বলে, অঘোরবাবা গত আড়াইশো বছর ধরে প্রতি বছর এক বার করে আসেন। ছেলেবেলায় নবীন অঘোরবাবার কাছে এসেছে। অঘোরবাবা কারও সঙ্গে কথা বলতেন না। আপন মনে ধুনি জ্বালিয়ে চুপচাপ বসে থাকতেন চোখ বুজে। লোকে ফল-মূল চাল-ডাল দিয়ে যেত মেলাই। সবই পড়ে থাকত। মাঝে-মধ্যে হয়তো এক-আধটা ফল খেতেন।

অঘোরবাবাকে নবীন মৌনী সাধু বলেই জানত। কিন্তু এক দিন সেই ভুল ভাঙল। বছর তিনেক আগে অঘোরবাবা যখন সকালে ধ্যানে বসেছিলেন, তখন নবীন এসে প্রণাম করে সামনে বসতেই অঘোরবাবা চোখ মেলে চাইলেন।

নবীনের দিকে স্থির দৃষ্টিতে খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন, "এ-জায়গাটার নাম কী রে?"

নবীন ভীষণ চমকে উঠল গমগমে সেই গলা শুনে। ভয়ে-ভয়ে বলল, "ঝিলের ও-পাশটা কেটেরহাট। তবে এ-দিকটার নাম হল চাঁপাকুঞ্জ। লোকে বলে 'চাঁপার বন'।

অঘোরবাবা তাঁর বিপুল গোঁফদাড়ির ফাঁকে একটু হেসে বললেন, "বড্ড ফাঁকা জায়গা। ভিতরটা একেবারে খোল।"

কথাটার মানে নবীন বুঝতে পারেনি। অঘোরবাবাও আর ব্যাখ্যা করেননি।

অঘোরবাবার সেই কথাটা আজ মনে পড়ল নবীনের। তা হলে কি চাঁপাকুঞ্জের তলায় মাটির নীচে কোনও গুহা আছে?

নবীন ঘুরতে ঘুরতে খাদের কাছে চলে এল। এখানেই ভুজঙ্গকে মেরে ফেলে রাখা হয়েছিল। নবীন খাদের ভিতরে নেমে চার দিক ঘুরে দেখল। কোথাও অনু-বিলুর কোনও চিহ্ন নেই।

হঠাৎ একটু শিরশিরে বাতাস বয়ে গেল, পাতায়-পাতায় শব্দ উঠল ফিসফিস। আর নবীনের গায়ে হঠাৎ কেন যেন কাঁটা দিয়ে উঠল।

তার পর নবীন সেই আশ্চর্য অশরীরী কণ্ঠস্বর শুনতে পেল, "চলো দক্ষিণে...দক্ষিণে... ভারী বিপদ।"

নবীন একটু হকচকিয়ে গিয়েছিল ঠিকই। কিন্তু চট করে দুর্বলতা কাটিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল। তার পর দক্ষিণ দিকে এগোতে লাগল।

চলতে চলতে চাঁপাকুঞ্জের চেনা ছক হারিয়ে গেল। সে শুনেছে, দক্ষিণের জঙ্গল গিয়ে মিশেছে সুন্দরবনে। এ-দিকটা সাঙ্ঘাতিক দুর্গম। লোকবসতি একেবারেই নেই।
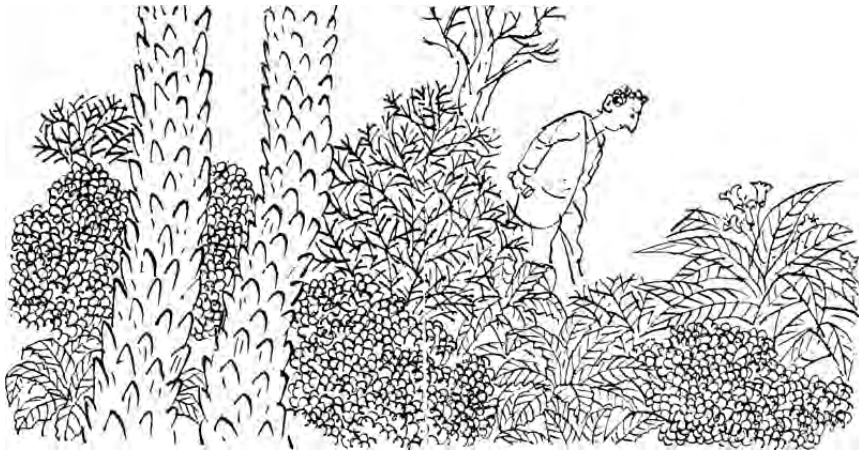
"এগোও...ভয় পেয়ো না...এগিয়ে যাও।"

আবার সেই কণ্ঠস্বর।

নবীন প্রাণপণে এগোতে লাগল। ক্রমে লতাপাতা কাঁটাঝোপ এত ঘন হয়ে উঠল যে, চলাই যায় না।

কিন্তু সেই অশরীরীর কণ্ঠস্বর তার কানে কানে বলে দিতে লাগল, "বাঁ দিক ঘেঁষে চলো...নিচু হও...ডাইনে ঘোরো..."

নবীন ঠিক-ঠিক সেই নির্দেশ মেনে চলতে লাগল।

আশ্চর্যের বিষয়, মিনিট পনেরো হাঁটবার পর সে একটা বেশ ফাঁকা জায়গায় পৌঁছে গেল। সামনে একটা বিশাল বটগাছ। তার তলাটা বাঁধানো।

নবীন টর্চ জ্বালল। শিশিরে-ভেজা নরম মাটিতে সে স্পষ্ট দেখতে পেল দু' জোড়া কেডসের ছাপ।

"পায়ের ছাপ ধরে এগোও...কুয়োর মধ্যে..."

নবীন কণ্ঠস্বরের নির্দেশ অনুযায়ী এগোতে লাগল। টর্চের আলোয় একটু বাদেই সে দেখতে পেল, একটা ভাঙা মস্ত উঁচু ইঁদারার মুখ।

এই কি সেই কুখ্যাত ফাঁসিখানা? এ-অঞ্চলের লোকের মুখে-মুখে ফাঁসিখানার কথা শোনা যায় বটে। নবীন ভেবেছিল, নিতান্তই আজগুবি গল্প। কিন্তু এ তো সত্যিকারের ফাঁসির মঞ্চ বলেই মনে হচ্ছে।

নবীন সিঁড়ি বেয়ে ইঁদারার ধারে উঠে পড়ল। ভিতরে টর্চ ফেলে দেখল, অগাধ গহ্বর। কিন্তু তলা থেকে বিস্তর লতাপাতা উঠে এসেছে ওপরে। সরু সিঁড়িটায় টর্চের আলো ফেলল সে। অনু আর বিলু কি এই সিঁড়ি দিয়ে নেমেছে? সাহস বটে বাচ্চা দুটোর।

এর পর কী করতে হবে, নবীনকে তা আর বলে দিতে হল না। সে নির্দ্বিধায় সিঁড়ি বেয়ে সাবধানে নামতে লাগল।

টর্চের আলোয় তলাটা কিছুই দেখা যাচ্ছে না। ইঁদারার গা বেয়ে নামতে নামতে নবীনের গায়ে ফের কাঁটা দিচ্ছিল। সে চাঁপাকুঞ্জের ফাঁপা অভ্যন্তরের সন্ধান পাবে কি?

সিঁড়ির শেষ ধাপটায় দাঁড়িয়ে পড়ে নবীন টর্চের আলোয় দেখতে পেল, পরের সিঁড়িটা যে সদ্য ভেঙে পড়েছে, তার সুস্পষ্ট দাগ রয়েছে ইঁদারার দেওয়ালে। দুই ভাই-বোন কি পড়ে গেছে এখান থেকে? পড়ে গেলে বেঁচে আছে কি এখনও?

নবীন একটা মোটা লতা ধরে ঝুলে পড়ল নীচে। তারপর ধীরে-ধীরে নামতে লাগল।

লতা খুব জোরালো নয়। মাঝে-মাঝে হড়াস করে খসে যাচ্ছে। নবীন সঙ্গে-সঙ্গে অন্য লতা ধরে ফেলছে চট করে।

বেশিক্ষণ লাগল না। নবীন মাটিতে নেমে দাঁড়াল। তলাটা ভেজা-ভেজা, গোড়ালি অবধি ডুবে গেল নরম কাদায়।

নবীন টর্চ জ্বালতেই দেখতে পেল, অনু আর বিলু দুটো ডল-পুতুলের মতো পড়ে আছে মাটিতে। নবীন নাড়ি দেখল, নাকে হাত দিয়ে দেখল। চোট খুব বেশি লাগেনি বলেই মনে হচ্ছে। ভয় আর শক-এ অজ্ঞান হয়ে গেছে।

নবীন ধীরে-ধীরে দু'জনকে সোজা করে শুইয়ে দিল। তার পর নাক টিপে ধরল। চোখে ফুঁ দিল, এ সব অবস্থায় কী করতে হবে, তা জানা না থাকায় এবং কাছে হোমিওপ্যাথির ওষুধও নেই বলে সে দু'জনকে একটু

কাতুকুতুও দিয়ে দেখল।

কয়েক মিনিট পরে প্রথমে চোখ মেলল অনু।

"অনু, ভয় পেয়ো না। আমি নবীনদা।"

"নবীনদা, বিলু কোথায়?"

"এই তো! ভয় নেই, এখনই জ্ঞান ফিরবে। তোমার তেমন চোট লাগেনি তো?"

অনু একটু হাত-পা নাড়া দিয়ে বলল, "ডান হাতটায় ব্যথা লেগেছে। মাথাতেও। তবে তেমন কিছু নয়।"

একটু বাদেই বিলুও বড়-করে শ্বাস ছেড়ে হঠাৎ কেঁদে উঠল, "দিদি! দিদি।"

অনু তার ভাইকে কোলে টেনে নিয়ে বলল, "এই তো আমি। তোর তেমন ব্যথা লাগেনি তো? এই দ্যাখ, নবীনদা এসেছে।"

বিলু কান্না থামিয়ে নবীনের দিকে চেয়ে বলল, "নবীনদা, তুমি কী করে বুঝলে যে, আমরা এখানে পড়ে গেছি?"

"সে অনেক কথা। কিন্তু আপাতত এখান থেকে বেরোবার উপায় করতে হবে।"

নবীন চার দিকে টর্চের আলো ফেলে দেখতে লাগল। ইঁদারার দেওয়ালে পুরু শ্যাওলা জমে আছে। স্তব্ধ হয়ে বসে আছে নানা আকারের শামুক। ফটফট করে ব্যাং ডাকছে। একটা কাঁকড়া বিছেকেও দেখা গেল টুক করে গর্তে ঢুকে যেতে। ইঁদারার মাঝখানটায় মেলা গাছপালা থাকায় স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। আর ইঁদারাটা তলার দিকে আরও অনেক বড়। প্রায় একটা হলঘরের মতো।

নীচে কাদা থাকায়, খুব সাবধানে পা ফেলতে হচ্ছিল তিনজনকে।

অনু বলল, "নবীনদা, এখান থেকে বেরোনোর তো আর উপায় নেই। লতা-পাতা বেয়েই উঠতে হবে..."

বিলু বলল, "আমার কনুইতে ভীষণ ব্যথা হচ্ছে। আমি লতা বেয়ে উঠতে পারব না।"

নবীন একটু হেসে বলল, "ঘাবড়িও না। এখান থেকে বেরোনোর কোনও একটা উপায় হবেই। কিন্তু আমি বারণ করা সত্ত্বেও তোমরা জঙ্গলে এসে ভাল কাজ করোনি। যে অবস্থায় পড়েছিলে, তাতে ভাল-মন্দ কিছু একটা হয়ে যেতে পারত।"

অনু একটু লজ্জিত হয়ে বলল, "আমরা ভেবেছিলাম, তুমি আমাদের ছেলেমানুষ ভেবে ভুলিয়ে-ভালিয়ে ফেরত পাঠাচ্ছ।"

"তোমরা তো ছেলেমানুষই। যাকগে, যা হওয়ার হয়েছে। এখন দেখা যাক, আমাদের ভাগ্যটা কেমন।"

তারা ইঁদারাটার চার-ধারে বার-দুই চক্কর দিল। দেওয়ালে পুরু শ্যাওলার আস্তরণ ছাড়া আর কিছুই নজরে পড়ল না।

নবীন দাঁড়িয়ে খানিকক্ষণ চিন্তা করে বলল, "অঘোরবাবা বলেছিলেন, চাঁপাকুঞ্জের তলাটা ফাঁপা। যদি সেকথা সত্যি হয়ে থাকে, তবে একটা পথ পাওয়া যাবেই।"

লাঠিটা দিয়ে নবীন ইঁদারার গায়ে ঘা মারতে লাগল ফাঁপা শব্দ শোনার জন্য। কিন্তু পাথরের গায়ে তেমন কোনও শব্দ পাওয়া গেল না।

বিলু একটু উত্তেজিত হয়ে উঠছিল। বলল, "ইশ, সত্যিই যদি একটা সুড়ঙ্গ পাওয়া যায়, তা হলে কী দারুণ ব্যাপার হবে!"

তিনজনেই কাদায় মাখামাখি হয়েছে। জুতোয় কাদা ঢুকে বিতিকিচ্ছিরি ব্যাপার। হাঁটাই শক্ত। বিলুর খিদে পেয়েছিল অনেক আগেই। এখন তেষ্টাও পেয়েছে।

হঠাৎ বিলুই চেঁচিয়ে বলল, "নবীনদা, দ্যাখো ওটা কী?"

টর্চের আলোয় একটা মস্ত ছুঁচোকে দেখে নবীন হেসে বলল, "ভয় পেয়ো না। ছুঁচো।"

বিলু বলল, "ভয় পাচ্ছি না। ছুঁচোটাকে ফলো করলেই বোঝা যাবে কোনও গর্ত আছে কি না।"

ছুঁচোটা ঝোপঝাড়ের মধ্যে গা ঢাকা দিল। কিন্তু আরও দু' একটাকে দেখা গেল, এদিক-ওদিক সরে যাচ্ছে।

বিলু চেঁচিয়ে উঠল, "নবীনদা! ওই যে! ওখানে একটা ছুঁচো ঢুকে গেল!"

নবীন জায়গাটা লক্ষ করে এগিয়ে গিয়ে আগাছা সরাতেই দেখতে পেল একটা গর্ত। গর্তটা বাস্তবিকই বেশ বড়। পাথরের জোড়ে একটা ফাটল। আগাছায় ঢেকে ছিল।

নবীন গর্তের মুখে লাঠিটা ঢুকিয়ে চাড় দিতে লাগল। ভয় হল, বেশি চাপ দিলে যদি লাঠি ভেঙে যায়!

নবীনের কানে-কানে কে যেন বলে উঠল, "লাঠি ভাঙবে না। লাঠিতে আমি ভর করে আছি।"

নবীন প্রাণপণে চাপ দিতে লাগল। আর খুব ধীরে-ধীরে পাথরটা সরতে লাগল। তার পর হঠাৎ খাঁজ থেকে খসে চৌকো পাথরটা ধপাস করে পড়ে গেল কাদার মধ্যে।

পাথরের পিছনে যে রন্ধ্র-পথটা উন্মোচিত হল, তা সঙ্কীর্ণ বটে, কিন্তু হামাগুড়ি দিয়ে ঢোকা যায়।

বিলু হাততালি দিয়ে চেঁচাল, "হুররে!"

বিলুর চিৎকারের প্রতিধ্বনি মিলিয়ে যাওয়ার আগেই আচমকা ওপরে ইঁদারার মুখ থেকে একটা ভীষণ শব্দ এল। দুম। ইঁদারার পরিসরে এবং গভীরে সেই শব্দ বোমার মতে ফেটে পড়ল। আর সেই সঙ্গে একটা আগুনের ফুলকির মতো কী একটা যেন ঝিং করে এসে বিঁধল ইদারার পাথরে।

তিনজনেই হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল এই ঘটনায়।

অনু বলল, "কেউ আমাদের তাক করে গুলি চালিয়েছে।"

কথাটা শেষ হতে-না-হতেই ওপর থেকে পর পর কয়েকটা গুলির শব্দ হল! লতাপাতা ভেদ করে বিদ্যুৎ-গতিতে কয়েকটা বুলেট কাদায় গেঁথে গেল।

নবীন হ্যাঁচকা টানে অনু আর বিলুকে টেনে নিয়ে গর্তের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে বলল, "পালাও, ওরা নেমে আসছে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমাদের পালাতে হবে।"

তিনজনে গর্তের মধ্যে হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকে পড়ল। অন টর্চ নিয়ে আগে-আগে। তার পর বিলু, সব শেষে নবীন।

নবীন বলল, "গর্তের মুখটা খোলা রইল। ওরা আমাদের সন্ধান ঠিকই পেয়ে যাবে।"

বিলু অবাক গলায় বলল, "ওরা কারা নবীনদা? গুলি করছে কেন?"

নবীন চাপা গলায় বলল, "বুঝতে পারছি না। গতকাল এরাই বোধহয় সিদ্ধিনাথ আর ভুজঙ্গকে মেরেছিল। ওদের প্রাণে মারেনি, কিন্তু আমাদের হয়তো প্রাণে মারবে।"

"কেন নবীনদা? আমরা কী করেছি?"

"হয়তো না-জেনে এমন কিছু করে ফেলেছি, যাতে ওদের স্বার্থে ভীষণ ঘা লেগেছে।"

সুড়ঙ্গ-পথে হামাগুড়ি দিয়ে এগোনো মোটেই সহজ কাজ নয়। সুড়ঙ্গটা ভীষণ নোংরা। চোখে-মুখে মাকড়সার জাল জড়িয়ে যাচ্ছে। হাত-পায়ের ওপর দিয়ে ইঁদুর আর ছুঁচো দৌড়ে যাচ্ছে বার বার। নীচে নুড়ি পাথরে বার বার হড়কে যাচ্ছে হাঁটু। ছড়ে কেটে যাচ্ছে হাতের তেলো। কিছুক্ষণের মধ্যে তিনজনেই হাঁপিয়ে পড়ল।

অনু জিজ্ঞেস করল, "একটু বসব নবীনদা?"

নবীন তাড়া দিয়ে বলল, "বিশ্রাম পরে হবে। এখন প্রাণ বাঁচানোটা আগে দরকার।"

অনু সখেদে বলল, "নীচে পড়বার সময় আমার বন্দুকটা যে কোথায় ছিটকে পড়ল, কে জানে! বোধহয় কাদার মধ্যে তলিয়ে গেছে। বন্দুকটা থাকলে জবাব দিতে পারতাম।"

নবীন বলল, "বন্দুক থেকেও লাভ ছিল না। ওরা আমাদের চেয়ে অনেক বেশি এক্সপার্ট। চলো, এগোও।"

আবার তিনজনে হামাগুড়ি দিয়ে বদ্ধ গুহার মধ্যে এগোতে লাগল। চার দিকে স্যাঁতসেঁতে। বাতাসে কেমন একটা গুমোট। পচা গন্ধও নাকে আসছে। মরা ইদুরই হবে।

টর্চের আলোয় দেখা গেল, ক্রমেই সুড়ঙ্গটা ওপরে উঠছে।

চড়াইতে উঠতে গিয়ে বিলু হড়কে গড়িয়ে পড়ল নীচে। তার ধাক্কায় অনু আর নবীনও। কিন্তু তার পরই ধুলো ঝেড়ে আবার উঠতে লাগল ওপরে।

পালাতেই হবে। পালাতেই হবে।

চড়াইটা পার হয়ে ওপরে উঠতেই তিনজন অবাক।

একটা মস্ত ঘরের মধ্যে তারা দাঁড়িয়ে আছে। অবশ্য ঘর বললে একটু বাড়াবাড়িই হয়ে যায়। পাথরের এবড়ো-খেবড়ো দেওয়াল, নীচেও নুড়ি-পাথর ছড়ানো। ঘরের মধ্যে বোধহয় দুশো বছরের বদ্ধ বাতাসের সোঁদা গন্ধ। টর্চের আলোয় যত দূর দেখা গেল, এখান থেকে বেরোনোর কোনও রাস্তা নেই।

অনু বলল, "নবীনদা, এবার কী করবে? এ তো দেখছি অন্ধকূপ!"

নবীন একটু চিন্তিতভাবে বলল, "চিন্তা ক'রো না, উপায় একটা হবেই।"

শীতে-জলে-কাদায় মাখামাখি হওয়ায় তিনজনেরই অবস্থা করুণ। তার ওপর পরিশ্রম বড় কম যায়নি।

নবীন টর্চটা ফেলে চার দিক ঘুরে-ঘুরে দেখতে লাগল।

নিরেট পাথর, কোথাও ফাঁক-ফোঁকর তার নজরে পড়ল না।

নবীনের শেষ ভরসা সেই অশরীরীর কণ্ঠস্বর। কিন্তু গুহায় ঢুকবার পর থেকেই সে আর স্বরটা শুনছে না। তবে নবীনের স্থির বিশ্বাস, কণ্ঠস্বরটা তার ঠাকুরদার। সে কিছুক্ষণ ইতস্তত করে অনু আর বিলুর কাছ থেকে যত দূর সম্ভব দূরে সরে গিয়ে ঘরের একেবারে কোণে দাঁড়িয়ে চাপা গলায় বলল, "দাদু! প্রম্পট করছ না কেন বলো তো?"

জবাব নেই।

"বলি, ও ঠাকুরদা, তোমার হলটা কী?"

তবুজবাব নেই।

হতাশ গলায় নবীন বলল, "বলি ঘুমিয়ে পড়লে নাকি, দাদু?"

হঠাৎ গলার স্বরটা শোনা গেল। কানের কাছে কে যেন খিঁচিয়ে উঠে বলল, "আমি তোর দাদু কোন সুবাদে রে বাঁদর? কুলদা চক্কোত্তির নাতি হলে কি তুই এত গবেট হতিস? যা, জাহান্নমে যা।"

বিলু হঠাৎ হেসে উঠে বলল, "ও নবীনদা, তুমি কার সঙ্গে কথা কইছ?"

নবীন কাঁচুমাচু হয়ে বলল, "কারও সঙ্গে নয়, এই আপনমনেই একটু কথা বলছিলাম আর কি! যাকে বলে থিংকিং অ্যালাউড।"

"মাটির নীচে এই ঘরটা কারা বানিয়েছিল নবীনদা?"

"জানি না ভাই, তবে আমাদের পূর্ব-পুরুষেরাই কেউ হবে।"

"কেন বানিয়েছিল, তা বুঝতে পারছ? গুপ্তধন লুকিয়ে রাখার জন্য। কিন্তু কোথাও তো ঘড়া বা কলসি দেখছি না!"

নবীন পায়ের নীচের নুড়ি-পাথরগুলো নেড়েচেড়ে দেখতে লাগল। সময় যে হাতে বেশি নেই, তা সে ভালই জানে। একটা বড় চ্যাটালো পাথর সরিয়ে তলাটা পরীক্ষা করতে করতে সে বলল, "গুপ্তধনের দরকার নেই ভাই, এখন এখান থেকে সরে পড়াটাই বেশি দরকার।"

এমন সময় হঠাৎ নীচের সুড়ঙ্গে পর পর কয়েকটা গুলি চালানোর শব্দ হল। আর সেই শব্দটা এই বদ্ধ ঘরে এত জোরে ফেটে পড়ল যে, তিনজনেই ভীষণ চমকে উঠে কানে হাত চাপা দিল।

বারুদের পোড়া গন্ধে ঘরটা ভরে যাচ্ছিল ধীরে-ধীরে।

নবীন হতাশ গলায় বলল, "ওরা নেমে এসেছে।"

অনু তার ভাইকে বুকে চেপে ধরে বলল, "কিন্তু আমরা তো ওদের শত্রু নই! যদি চেঁচিয়ে সে-কথা ওদের বলা যায়, তা হলে কী হয়?"

নবীন চিন্তিতভাবে বলল, "চেষ্টা করা যেতে পারে, কিন্তু খুব লাভ হবে বলে মনে হয় না।"

নবীন সুড়ঙ্গের মুখটায় এগিয়ে গেল। তার পর চেঁচিয়ে বলল, "গুলি করবেন না। আমাদের সঙ্গে দুটো বাচ্চা আছে। আমরা বিপদে পড়েছি।"

কিন্তু নবীনের কথা শেষ হওয়ার আগেই ফের কয়েকটা গুলি এসে পাথরের গায়ে বিঁধল। পাথরের কুচি ছিটকে এসে লাগল নবীনের মুখে। সে সভয়ে সরে এল।

বলল, "এরা খুনে।"

বিলু অনুর হাত থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বলল, "তুই, আমার জন্য ভয় পাচ্ছিস, দিদি? মরলে সবাই মরব। অত ভয় কী? এখানে অনেক পাথর আছে। ওরা ওপরে ওঠার চেষ্টা করলে পাথর ছুঁড়ে মারা যাবে। কিন্তু ওদের গুলিতে আমাদের কিছুই হবে না।"

নবীন টর্চটা অনুর হাতে দিয়ে বলল, "বিলু ঠিকই বলেছে। তবে ওদের ঠেকানোর ভার আমার ওপর। তোমরা দু'জনে ঘরটা খুঁজে দ্যাখো, কোথাও বেরোবার পথ পাও কি না।"

নবীন সুড়ঙ্গের মুখটায় ঘাপটি মেরে বসে রইল। হাতে পাথর। এই বিপদের মধ্যেও সে ভাবছিল, কুলদা চক্রবর্তী লোকটা কে? নামটা কখনও শুনেছে বলে তার মনে পড়ছিল না। তবে চাঁপাকুঞ্জের কালীবাড়ির পুরুতরা চক্রবর্তী ছিলেন। তাঁদের কেউ কি?

নবীন শুনতে পেল, সুড়ঙ্গ দিয়ে কয়েকজন লোক বুক-ঘষটে এগিয়ে আসছে। খুবই সন্তর্পণে আসছে, কিন্তু বদ্ধ জায়গায় শব্দ গোপন করা যাচ্ছে না।

নবীন শ্বাস বন্ধ করে অপেক্ষা করতে লাগল।

টর্চের অত্যন্ত জোরালো আলোয় তলার সুড়ঙ্গটা উদ্ভাসিত হয়ে গেল। একটা লোককে আবছা দেখা গেল, হামাগুড়ি দিয়ে নীচে এসে থেমেছে।

নবীনের হাতের পাথর নির্ভুল লক্ষ্যে ছুটে গিয়ে ঠং করে লাগল লোকটার মাথার টুপিতে। টুপিটা লোহার। লোকটা একটুও না দমে হাতটা উঁচু করে ধরল। একটা পিস্তলের মুখ দেখতে পেল নবীন। চট করে মাথাটা সরিয়ে নিল সে।

ঝিং করে গুলিটা গিয়ে লাগল ঘরের ছাদে। ঘরটা কি কেঁপে উঠল সেই শব্দে?

তার পর দু' পক্ষ চুপচাপ। নবীন টের পাচ্ছিল, তার পিছনে অনু-বিলু সারা ঘরময় দৌড়ে বেড়াচ্ছে। টর্চ জ্বেলে পথ খুঁজছে। যদি কোনও ফাটল বা গর্ত নজরে পড়ে।

নবীন সাবধানে আবার মুখটা বাড়াল। যা দেখল, তাতে বুক হিম হয়ে গেল তার। সামনের লোকটা বুক-ঘষটে আরও খানিকটা উঠেছে। কোমর থেকে কী একটা জিনিস খুলে নিয়ে লোকটা হঠাৎ ওপর দিকে ছুঁড়ে মারল।

কিছু বুঝে উঠবার আগেই একটা প্রচণ্ড শব্দ আর আলোর ঝলকানি। গুহাটা যেন ফেটে চৌচির হয়ে গেল, এবং এত প্রচণ্ড আওয়াজ নবীন কখনও শোনেনি। তার মাথাটা হঠাৎ ঝিম ধরে, কানে তালা লেগে, চোখ অন্ধকার হয়ে গেল। অজস্র পাথরের টুকরো আর ধুলোবালি খসে পড়ল তার ওপর।

নবীন জ্ঞান হারিয়ে ফেলল কিছুক্ষণের জন্য।

হঠাৎ তাকে নাড়া দিয়ে অনু বলল, "নবীনদা! নবীনদা! শিগগির! পথ পেয়েছি।"

নবীন চোখ খুলল। তার পর ধীরে-ধীরে উঠে বসল। উঁকি মেরে দেখল, প্রচুর পাথরের টুকরো আর ধুলোবালি খসে পড়ায় নীচের সুড়ঙ্গটা প্রায় ঢেকে গেছে। লোকটাকে আর দেখা যাচ্ছে না। ধুলো আর ধোঁয়ায় তিনজনই কাঁপছে, চোখে জল।

নবীন উঠল, কিছুক্ষণ সময় পাওয়া যাবে। তবে বেশি নয়। ওরা এই সামান্য বাধা ডিঙিয়ে ঠিকই চলে আসবে।

অনু তার হাত ধরে টেনে নিতে নিতে বলল, “বোমার শব্দে আমরা ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু শাপে বর হয়েছে। দেখবে এসো।”

নবীন দেখল, গুহার ডান ধারে পাথরের দেওয়ালে বিশাল চিড় ধরেছে। একটা চৌকো পাথর আলগা হয়ে নড়বড় করছে।

নবীন এবার একটু ভাবল, পাথরটাকে যদি সে সামনের দিকে টেনে সরায়, তা হলে ছিদ্রটা ফের বন্ধ করার উপায় থাকবে না, এবং পাজি লোকগুলো পথের সন্ধান সহজেই পেয়ে যাবে। তাই সে পাথরটাকে ভিতরের দিকে প্রাণপণে ঠেলতে লাগল।

পাথরটা ধীরে-ধীরে সরে যেতে লাগল। মাত্র হাত-খানেক লম্বা এবং চওড়া একটা পথ পাওয়া গেল।

অনু আর বিলু সহজেই গলে গেল ভিতরে। সব-শেষে নবীন।

পাথরটাকে আবার জায়গামতো বসিয়ে দিতে সামান্য সময় লাগল নবীনের। টর্চের আলোয় দেখা গেল, একটা লম্বা সরু পথ টানা বহু দূর চলে গেছে।

টর্চের আলো কমে আসছে। বেশিক্ষণ জ্বলবে না। ক্লান্ত পায়ে চুপচাপ তিনজন হাঁটতে লাগল। কোথায় যাচ্ছে তা বুঝতে পারছে না।

বিলু শ্রান্ত স্বরে বলল, “নবীনদা, ওরা যদি এই গলিতে ঢুকতে পারে, তা হলে আমাদের তাক করে গুলি চালাতে খুব সুবিধে হবে, তাই না? গলিটায় কোনও বাঁক নেই, উঁচু-নিচু নেই।”

নবীন তা জানে। আর জানে বলেই সে নিজে পিছনে রয়েছে। গুলি যদি আসে, তবে তা তার গায়েই প্রথম বিঁধবে।

নবীন অভয় দিয়ে বলল, “ওরা নিজেরাও এখন বিপদের মধ্যে আছে। চলো, ওসব কথা ভাববার দরকার নেই। জীবনে সব সময়েই উজ্জ্বল সম্ভাবনার কথা ভাববে।”

কয়েক মিনিট হাঁটবার পর গলিটা হঠাৎ সরু হয়ে গেল। তার পর ঢালুতে নেমে থমকে দাঁড়াতে হল তিনজনকে, সামনে আর রাস্তা নেই। গলিটা ঢালু হয়ে কালো জলের মধ্যে নেমে হারিয়ে গেছে।

বিলু বলল, “এখন?”

অনুও সভয়ে নবীনের দিকে চেয়ে বলল, “নবীনদা, টর্চটা আর বেশিক্ষণ জ্বলবে না কিন্তু!”

নবীন জানে, বিপদে মাথা গুলিয়ে ফেললে লাভ নেই। এখনই মাথা ঠাণ্ডা রাখার সময়।

মনে যাই থাক, মুখে একটু নির্ভয় হাসি হেসে নবীন বলল, “ঘাবড়াচ্ছ কেন? সাঁতার জানো তো?”

অনু মাথা নেড়ে বলল, “সাঁতার জেনে তো লাভ নেই, সুড়ঙ্গটা জলের মধ্যে ঢুকে গেছে। তার মানে জলটা পার হতে হবে ডুব-সাঁতার দিয়ে। জলের ভিতর দিয়ে কতটা যেতে হবে, তা তো জানি না!”

নবীন তার কোটটা খুলে ফেলল। বলল, “আরে সেটা কোনও সমস্যাই নয়। আমি চট করে জলে নেমে দেখে আসছি। যদি পার না হওয়াই যায়, তা হলে অন্য উপায় বের করতে হবে।”

“এই ঠাণ্ডায় তুমি জলে নামবে?”

“আমি কেন, তোমাদেরও হয়তো নামতে হবে, তৈরি থেকো। মনটাকে শক্ত করো, পারবে।”

নবীন সাবধানে জলে পা দিল, তার পর বুক ভরে দম নিয়ে বরফের মতো ঠাণ্ডা জলে ডুব দিল।

প্রথমটায় অন্ধকারে কিছুই দেখতে পেল না সে, শুধু এগিয়ে যেতে লাগল। ঠাণ্ডায় হাত-পা প্রায় অসাড় হয়ে আসছিল তার। কিন্তু বাঁচতেই হবে। এবং বাচ্চা দুটোকে বাঁচাতেও হবে।

তার বলিষ্ঠ হাত ও পায়ের তাড়নায় জল ছিটকে সে হুশ করে মাথা তুলল। বুঝতে পারল, মাথার ওপরটা ফাঁকা। জলের ওপর গুহার ছাদ উঁচুতে উঠে গেছে।

নবীন জলে ভেসে কয়েক সেকেণ্ড বিশ্রাম নিল। হাতে সময় একেবারেই নেই।

বুক-ভরে দম নিয়ে সে আবার ডুব দিয়ে ফিরে চলল।

জলের ওপর মাথা তুলে সে দেখল, ঘুরঘুট্টি অন্ধকার।

"অনু! বিলু!"

প্রথমটায় কেউ সাড়া দিল না।

তার পর খুব ক্ষীণ কণ্ঠে অনু বলল, "নবীনদা! ফিরে এসেছ?"

"হ্যাঁ।"

"এই গলিতে ওরা ঢুকে পড়েছে। আলো ফেলছে। দু' বার গুলিও চালিয়েছে। ও পাশে কী দেখে এলে?"

"তোমরা ডুব-সাঁতার দিতে পারবে?"

"পারব। আমরা দু'জনেই ভাল সাঁতার জানি।"

"তা হলে ভয় নেই। মিনিট-খানেক ডুব-সাঁতার দিতে পারলেই জলে-ডোবা জায়গাটা পেরিয়ে যাব। ও দিকে মাথার ওপর ফাঁকা জায়গা আছে। তবে তারপর খানিকটা সাঁতরাতে হবে! গায়ের ভারী জামাগুলো খুলে ফ্যালো। আর আমার লাঠিটা দু'জনেই চেপে ধরো। আমি টেনে নিয়ে যাব।"

দুই ক্লান্ত ভাই-বোন কোট-টোট ছেড়ে ফেলল। তারপর লাঠি ধরে জলে নামল। বরফের মতো ঠাণ্ডা জলে নামতেই ঠকঠক করে কেঁপে উঠল দু'জন।

কিন্তু ঠিক এই সময়েই দুম করে একটা বিকট আওয়াজে গলিটা কেঁপে উঠল।

লাঠিটা চেপে ধরে অনু, বিলু আর নবীন দম বন্ধ রেখে জলে ডুবে পড়ল।

নিকষ কালো জলের মধ্যে শুধু লাঠিটাই তাদের পরস্পরের মধ্যে যোগাযোগ।

নবীন প্রাণপণে এগোচ্ছিল। তবে এক-হাতে লাঠি ধরে-থাকায়, খুব জোরে সাঁতারাতে পারছিল না সে।

কিন্তু প্রাণের ভয় বড় ভয়।

আচমকাই নবীন টের পেল, অসাড় হাত থেকে কখন লাঠিটা খসে গেছে।

আতঙ্কে নবীন জলের মধ্যে চার ধারে হাতড়াতে লাগল। লাঠি! লাঠিটা কোথায়?

মাথার ওপরে ছাদে দুম করে মাথা ঠুকে গেল তার। চোখ পলকের জন্য অন্ধকার হয়ে গেল। তবু দাঁতে দাঁত চেপে নিজেকে সচেতন রাখল সে।

আচমকাই লাঠিটা পেয়ে গেল পায়ের কাছে। চেপে ধরে এগোতে গিয়েই বুঝল, ওরা ভাই-বোন লাঠিটা ছেড়ে দিয়েছে।

হায়-হায় করে উঠল নবীনের বুকটা। বাচ্চা দুটো ছেলে-মেয়ে এভাবে বেঘোরে ডুবে গেল? সে কিছু করতে পারল না? নিজের হাত কামড়াতে ইচ্ছে করছিল তার।

কিন্তু দম শেষ হয়ে আসছে। আর বেশিক্ষণ নয়। এক্ষুনি সে নিজেও ডুবে যাবে, যদি সেও মরে, তবে বাচ্চা দুটোর খোঁজ করবে কে?

নবীন প্রাণপণে তার অসাড় হাত-পা নাড়তে লাগল।

যখন জল থেকে মাথা তুলে শ্বাস নিতে পারল নবীন, তখন তার বুক হাপরের মতো উঠছে পড়ছে।

কিছুক্ষণ কোনও কিছু চিন্তা কমতে পারল না নবীন। শুধু হাঁ করে দম নিল। তার পর ধীরে-ধীরে স্বাভাবিক হয়ে এল তার শ্বাস।

অনু আর বিলু কোন্ অতলে গেল, কে জানে! বিপদ থেকে বাঁচিয়ে এত দূর এনেও শেষরক্ষা হল না? নবীন কনকনে ঠাণ্ডা জলে থেকেও গায়ে শীত টের পাচ্ছে না। বাচ্চা দুটোর জন্য দুঃখে নিজের শরীরের কষ্টও সে ভুলে গেছে।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে আবার ডুব দিতে যাচ্ছিল। হঠাৎ একটা ক্ষীণ গলার স্বর শুনতে পেল, "নবীনদা!"

"কে, অনু?" আশায় আনন্দে ব্যাকুল হয়ে নবীন চেঁচাল।

"হ্যাঁ। তুমি কোথায়?"

"এই তো! তোমরা দুজনেই কি আছ একসঙ্গে?"

"হ্যাঁ। আমরা তো তোমার লাঠি ছেড়ে দিয়ে আগে-আগে সাঁতরে চলে এসেছি।"

নবীনের বুক থেকে একটা ভার নেমে গেল। গলার স্বর কোথা থেকে আসছে আন্দাজ করে সে এগিয়ে গেল। অনু আর বিলু প্রায় দশ-বারো হাত এগিয়ে গিয়ে তার জন্য অপেক্ষা করছিল।

অন্ধকারে কেউ কারও মুখ দেখতে পেল না। তিনজনেরই হাঁফ-ধরা অবস্থা। বেশি কথা বলা অসম্ভব।

নবীন শুধু বলল, "চলো।"

তিনজন পাশাপাশি সাঁতরাতে লাগল।

বিলু জিজ্ঞেস করল, "নবীনদা, ওরা কি জল পেরিয়ে আমাদের পিছু নিতে পারবে?"

নবীন বলে, "কিছুই অসম্ভব নয়। তবে ওরা হয়তো আমাদের ফেলে-রাখা জামাকাপড় দেখে ভাববে, ভয়ে আমরা জলে ডুবে গেছি, আর জলে-ডোবা সুড়ঙ্গ তো ভীষণ বিপজ্জনক। ওরা হয়তো চট করে এ-পথে আসবে না।"

অনু আর বিলু সত্যিই ভাল সাঁতরায়। বেশি জল না ছিটকে, নিঃশব্দে লম্বা জল টেনে দু'জনে নবীনের চেয়েও দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছিল।

"এ রকম আর কতক্ষণ সাঁতরাতে হবে, নবীনদা? আমরা কোথায় যাচ্ছি বলো তো?" অনু জিজ্ঞেস করল।

নবীন সখেদে বলে, "কে জানে? জন্ম থেকেই তো কেটেরহাটে আছি, এখানে যে এ রকম সব সুড়ঙ্গ বা মাটির নীচে এ রকম জলে-ডোবা জায়গা আছে, কস্মিনকালেও জানতাম না।"

আরও বেশ কিছুক্ষণ পর তিনজনেই একসঙ্গে পায়ের নীচে মাটি পেয়ে দাঁড়াল। ঢালু, পিছল জমি। সামনে নিকষ-কালো অন্ধকার। এত অন্ধকার যে মনে হয়, চোখ বুঝি অন্ধই হয়ে গেছে হঠাৎ।

ধীরে-ধীরে তিনজন ঢালু বেয়ে উঠল। অবসন্ন, দুর্বল চলচ্ছক্তিহীন।

নবীন মায়াভরে বলল, "আর ভয় নেই, পথ এবার পাবই, বসে একটু জিরিয়ে নাও।"

অনু, বিলু ধপ-ধপ করে বসে পড়ল।

নবীন একটু দম নিয়ে বলল, "কেটেরহাটে অনেক কিংবদন্তি আছে। আমি সেগুলো এতকাল মোটই বিশ্বাস করিনি। আজকের অভিজ্ঞতায় বুঝতে পারছি, সবটাই কিংবদন্তি নয়। পিছনে কিছু সত্যও আছে।"

বিলু সোৎসাহে বলে উঠল, "কিংবদন্তির গল্পগুলো বলবে আমাদের নবীনদা?"

নবীন একটু হাসল। বলল, "বলব। আগে তো তোমাদের এই অন্ধকূপ থেকে উদ্ধার করি।"

অনু কিন্তু দিব্যি হাসি-মাখাননা গলায় বলল, "তুমি আমাদের কথা ভেবে এত ঘাবড়ে যাচ্ছ কেন বলো তো নবীনদা? আমি কিন্তু একটুও দুশ্চিন্তা করছি না। বরং অ্যাডভেঞ্চারটা বেশ ভাল লাগছে। আমি একবার বড়ধেমো কয়লাখনিতে নেমেছিলাম। আমার এক মেসোমশাই চাকরি করেন ওখানে। একটুও ভয় করেনি। এটাকেও তেমন একটা খনিগর্ভ বলে মনে হচ্ছে।"

নবীন চিন্তিতভাবে বলল, "কে জানে কী! হতেও পারে কোনও পুরনো আমলে ইংরেজরা হয়তো খনি-টনি খুঁড়েছিল। তার পর কাজ আর এগোয়নি। এখন চলো, ওঠা যাক।"

টর্চ নেই। সামনে নিবিড় অন্ধকার। ভরসা শুধু নবীনের লাঠিগাছ। নবীন লাঠিটা সামনে বাড়িয়ে ঠুকে-টুকে রাস্তার আন্দাজ করে চলতে লাগল। পিছনে অনু আর বিলু।

বেশ কিছুটা চলার পর নবীন টের পেল, পায়ের তলার জায়গাটা যেন শান-বাঁধানো।

আরও খানিকটা এগোনোর পরই লাঠিটা একটা দেওয়ালে ঠেকে গেল। হয় রাস্তা বন্ধ, না হলে গলিটা বাঁক নিয়েছে।

নবীন বলল, "দাঁড়াও। সামনে বাধা আছে।"

অনু-বিলু দাঁড়িয়ে গেল।

নবীন দেওয়ালটা হাতড়ে দেখল। চৌকো পাথরের দেওয়াল। চার দিক হাতড়াতে গিয়ে হঠাৎ সে টের পেল, দেওয়ালের গায়ে একটা দরজা রয়েছে। কাঠের দরজা, নবীন দরজাটা ঠেলল।

বহু পুরনো কাঠে ঘুণ ধরে একেবারে ঝুরঝুরে হয়ে গেছে। এক ঠেলাতেই দরজাটা ভেঙে পড়ে গেল।

"কী হল নবীনদা?" অনু আর বিলু একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল।

"একটা দরজা। তোমরা এখানেই দাঁড়াও, আমি ঘরের ভিতরটা আগে দেখে নিই।"

নবীন ভিতরে ঢুকল। ঘরের মধ্যে সেই পুরনো বদ্ধ বাতাসের সোঁদা গন্ধ। ইঁদুরের দৌড়োদৌড়ি তো আছেই। নবীন হাতড়ে দেখতে গিয়ে হঠাৎ একটা পুজোর ঘণ্টা পেয়ে গেল। বেশ ভারী আর বড়সড়। নাড়তেই চমৎকার ঠুনঠুন শব্দ হল।

সভয়ে বিলু চেঁচিয়ে উঠল, "ঘণ্টা বাজছে কেন নবীনদা?"

নবীন অভয় দিয়ে বলল, "ভয় নেই। আমিই বাজিয়েছি। এটা একটা মন্দির।"

"আমরা ঢুকব?"

"এসো। মাটির নীচে এ রকম একটা মন্দিরের কথা আমরা ছেলেবেলা থেকে শুনে আসছি। আজ বিশ্বাস হল। সিদ্ধিনাথও এই মন্দিরটা বহুকাল ধরে খুঁজছে।"

অনু আর বিলুও অন্ধকারে চার দিক ঘুরে দেখতে লাগল। অন্ধকারে তারা মন্দিরের মধ্যে আরও কিছু জিনিস আবিষ্কার করল। একটা মস্ত পিতলের প্রদীপ, একটা পাথরের সিংহাসনে একটা বিগ্রহ, কয়েকটা পুজোর বাসনকোসন, কোষাকুষি, একটা লোহার সিন্দুক।

সবচেয়ে প্রয়োজনীয় আবিষ্কারটা অবশ্য করল বিলু। দুটো পাথর। একটা জরাজীর্ণ কাঠের বাক্স হাতড়াতে গিয়ে দুটো পাথর আর কয়েকটা লম্বা সরু কাঠির মতো বস্তু পেয়ে গেল সে।

"নবীনদা, এগুলো কী বলো তো? দুটো পাথর, আর কয়েকটা কাঠি!"

নবীন বলল, "দাও, ওগুলো আমার হাতে দাও। কপাল ভাল থাকলে ও-দুটো চকমকি পাথরই হবে।"

নবীন পাথর দুটো সামান্য ঠুকতে চমৎকার স্ফুলিঙ্গ দেখা গেল। কাঠির মাথায় বারুদ বা ওই জাতীয় কোনও সহজ-দাহ্য বস্তু লাগানো। খুব সাবধানে কয়েক বারের চেষ্টায় নবীন একটা কাঠি ধরিয়ে ফেলতে পারল।

প্রদীপের সলতে বা তেল নেই। কাঠির সামান্য আগুনটা অবশ্য বেশ কিছুক্ষণ জ্বলল। নবীন খুঁজে-পেতে একটা পেতলের ছোট কলসি পেয়ে গেল। থাকারই কথা। কেটেরহাটের বিখ্যাত শীতলা মন্দিরেও এ রকমই কলসিতে প্রদীপের ঘি রাখা হয়। মুখবন্ধ কলসির মধ্যে হাত ঢুকিয়ে নবীন দেখল, তলানি ঘি এখনও আছে। তবে জমাট আর শক্ত। খামচে-খামচে তাই তুলে প্রদীপে দিল নবীন। নিভন্ত কাঠি থেকে আর-একটা ধরিয়ে নিল। পকেট থেকে ভেজা রুমালটা বের করে অনুকে দিয়ে বলল, "চটপট এটা পাকিয়ে সলতের মতো করে দাও।"

সামান্য পরেই প্রদীপ জ্বলে উঠল। এতক্ষণ অন্ধকারে কাটানোর ফলে সামান্য প্রদীপের আলোতেই তিনজনের চোখ ধাঁধিয়ে গেল।

তার পর অবাক বিস্ময়ে তারা ভূগর্ভের মন্দিরটা ভাল করে তাকিয়ে দেখতে লাগল।

বেশি বড় নয়, মাঝারি একটা চৌকোনা ঘর। পাথর দিয়ে তৈরি। পাথরের সিংহাসনে কালো পাথর দিয়ে তৈরি একটা দেড় হাত লম্বা বিষ্ণুমূর্তি। ভারী চমৎকার মূর্তিটার গঠন। তবে ময়লা পড়েছে বিস্তর।

অনু বলল, "বাঃ, কী সুন্দর!"

নবীন লোহার সিন্দুকটার কাছে গিয়ে দেখল, পুরনো তালা মরচে পড়ে ঝুরঝুরে হয়ে আছে। লাঠির একটা ঘায়ে তালাটা ভেঙে পড়ে গেল।

নবীন ডালা খুলে দেখল, ভিতরে সোনা ও রুপোর কয়েকটা বাসনকোসন রয়েছে। সন্দেহ নেই যে, ঠাকুরের ভোগের জন্যই এই সব বাসন-কোসন।

ডালাটা আবার বন্ধ করে দিল নবীন।

মন্দিরের চার দেওয়ালে চারটে দরজা। একটা ভেঙে তারা ঢুকেছে, আর তিনটে বন্ধ।

নবীন এক-এক করে চারটে দরজাই খুলে ফেলল। চার দিকে চারটে পথ গেছে। মহা সমস্যা। কোন পথে যাওয়া যায়?

বিলু বলল, "নবীনদা, এসো, টস্ করে ডিসিশন নিই।"

নবীন একটু চিন্তা করল, তার পর বলল, "এ-জায়গাটা মোটামুটি নিরাপদ। তোমরা ভাই-বোনে এখানেই বসে থাকো, আমি একটু দেখে আসি।"

কিন্তু এই প্রস্তাবে অনু আর বিলু রাজি হল না। অনু বলল, "আমাদের আর বিশ্রামের দরকার নেই। আমরাও তোমার সঙ্গে যাব।"

"তা হলে এসো, এক যাত্রায় আর পৃথক ফলের দরকার কী?"

মস্ত প্রদীপটায় আর-একটু ঘি দিয়ে নবীন সেটা হাতে তুলে নিয়ে বলল, "এই আলোই আমাদের এখন একমাত্র ভরসা।"

প্রথম দরজাটা দিয়ে বেরিয়ে খানিক দূর এগিয়ে বোঝা গেল, সেটা নদীর দিকে ঢালু হয়ে নেমে গেছে। খানিক দূর এগিয়ে যেতেই দেখা গেল, পথটা আবার গিয়ে জলে ডুবে গেছে।

নবীন বলল, "এটাই হয়তো বড় ঝিলের তলা। সিদ্ধিনাথদা এই পথটাই খুঁজে বের করার চেষ্টা করেছে এত দিন। চলো ফিরে যাই।"

তিনজন আবার মন্দিরে ফিরে এল। তার পর বিগ্রহের পিছন দিককার দেওয়ালের দরজাটা দিয়ে এগোতে লাগল। এই পথটা একটা সিঁড়ির মুখে গিয়ে শেষ হয়েছে। সরু একটা খাড়া সিঁড়ি উঠে গেছে ওপর দিকে।

নিঃশব্দে তিনজন ওপরে উঠতে লাগল। খানিক দূর উঠে একটা গলি পেল তারা। খুবই সঙ্কীর্ণ গলি। খানিক দূর গিয়ে আবার সরু সিঁড়ি।

উঠতে উঠতে এক জায়গায় থেমে যেতে হল। সামনে একটা নিরেট দরজা।

নবান দরজাটা নাড়া দিল। কিন্তু এ-দরজাটা লোহার তৈরি। বেশ পুরু পাতের। সহজে নড়ল না। এমনও হতে পারে যে, ও পাশে তালা বা হুড়কো লাগানো আছে।

নবীন প্রদীপের আলোয় দরজাটার ওপর থেকে নীচ অবধি ভাল করে দেখল।

অনু বলল, "নবীনদা, এখানে দেওয়াল থেকে একটা শেকল ঝুলছে, টানব শেকলটা?"

নবীন করুণ গলায় বলল, "কিছু না করার চেয়ে কিছু করাই ভাল। টানো।"

অনু শেকলটা খুব টানল। প্রথমটায় কিছু হল না, তার পর কয়েকটা হ্যাঁচকা টান দিতেই দরজার ওপাশে একটা ঘং করে শব্দ হল। একটা হুড়কো বা কিছু যেন খুলে গেল।

এবার খুব সহজেই দরজাটা খুলে ফেলতে পারল নবীন। এবং ঘরে ঢুকে ভীষণ অবাক হয়ে গেল।

এ কি তার বাড়ির সেই পাতালঘর? তেমনই গোল আকারের?

প্রদীপের আলোয় নবীন আরও যা দেখল, তা মাথা ঘুরিয়ে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। ঘরের মধ্যে সাতটা বড়-বড় মাটির জালা মুখ-ঢাকা অবস্থায় দেওয়ালের সঙ্গে সার দিয়ে দাঁড় করানো। দেওয়ালে মরচে ধরা সড়কি, বল্লম, তলোয়ার ঝুলছে। চারটে গাদা বন্দুকও। মেঝেময় পুরু ধুলোর আস্তরণ।

নবীন হঠাৎ আনন্দে চেঁচিয়ে উঠল, "এ যে আমার সেই পাতালঘর!"

"কিসের পাতালঘর নবীনদা?" অনু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে।

"আর চিন্তা নেই। আমরা আমাদের বাড়ির তলাকার পাতালঘরে পৌঁছে গেছি। এই ঘরে ঢুকবার অনেক চেষ্টা করেও পারিনি, আজ তোমাদের জন্যই পেরেছি।"

নবীন ব্যগ্র হাতে জালার মুখের ঢাকনা সরাতে লাগল। যা ভেবেছিল, তা-ই। জালার মধ্যে রাশি-রাশি সোনাদানা, বেশির ভাগই মোহর আর গয়না।

"ইশ, নবীনদা, তুমি যে বড়লোক হয়ে গেলে?"

নবীন কেমন বিহ্বল হয়ে গিয়ে বলল, "বড়লোক! হ্যাঁ, তা এক রকম বলতে পারো।"

নবীন দেখল, ঘরের অন্য দিকে আর-একটা লোহার দরজা রয়েছে। এই দরজাটি তার বাড়িতে ঢোকার রাস্তা, সন্দেহ নেই। দেওয়াল থেকে একটা শেকল ঝুলছে।

নবীন শেকলটা টানল, প্রথমটায় কিছুতেই টানা যাচ্ছিল না, প্রাণপণে হ্যাঁচকা টান মারতেই দরজার ভিতরে একটা গুপ্ত হুড়কো খুলে যাওয়ার শব্দ হল ঘটাং করে। তার পর এক-পাল্লার পুরু দরজাটা ভিতর দিকে টানতেই খুলে যেতে লাগল। অবশ্য বিস্তর শব্দ হল তেলহীন কব্‌জায়।

দরজার ওপাশে সেই চেনা গলি। নবীন কত দিন এইখানে বসে দরজাটা খোলার উপায় চিন্তা করেছে।

আবেগে নবীনের চোখে জল এসে গেল।

"কী হল, নবীনদা? দাঁড়িয়ে ও রকম ভাবে চেয়ে আছ কেন?" অনু নরম গলায় জিজ্ঞেস করল।

নবীন চোখ মুছে বলল, "সে অনেক কথা। চলো, রাস্তা পাওয়া গেছে। তোমরাও এখন নিরাপদ। আমার সঙ্গে এসো।"

অনু আর বিলু কোনও কথা বলল না। নীরবে নবীনের পিছু পিছু চলতে লাগল।

এবার নবীন তার চেনা জায়গায় এসে পড়েছে। সুতরাং পাতালঘর থেকে উঠে আসা কোনও সমস্যাই হল না।

নবীনের বাড়িতে এখন নিশুতি রাত। পিসি তার ঘরে ঘুমোচ্ছে। মহাদেব তার ঘরে।

এতক্ষণ বদ্ধ বাতাসে তাদের ততটা শীত করেনি। কিন্তু এখন বাইরে আসতেই খোলা হাওয়ায় ভেজা শরীরে প্রচণ্ড শীত করে তিনজনেই কেঁপে উঠল।

নবীন তার চাদর-টাদর যা পেল, তাই দিয়ে দুই ভাই-বোনকে বলল, "এগুলো গায়ে জড়িয়ে নাও। তার পর চলল, তোমাদের বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসি। আমার এখন অনেক কাজ আছে।"

অনু সঙ্গে-সঙ্গে উদ্বিগ্ন গলায় বলল, "কী কাজ নবীনদা?"

নবীন ঠাণ্ডা গলায় বলল, "যে বদমাশরা আমাদের খুন করতে চেয়েছিল, এবার তাদের একটু তল্লাশ নিতে হবে।"

অনু সঙ্গে-সঙ্গে বলল, "আমিও যাব।"

নবীন মাথা নেড়ে বলল, "তা হয় না। কাজটা খুব বিপজ্জনক। ওই সুড়ঙ্গের মধ্যে তোমাদের আর নিয়ে যেতে পারব না।"

বিলু অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে বলল, "আমরাও তা হলে বাড়ি যাব না।"

নবীন দেখল, মহা বিপদ। এরা দুই ভাই-বোন মোটেই ভিতু ধরনের নয়। বরং রীতিমতো শক্তপোক্ত এবং দারুণ সাহসী, যথেষ্ট বুদ্ধিও রাখে। তার চেয়েও বড় কথা, ভীষণ একগুঁয়ে। সহজে এদের হাত এড়ানো যাবে বলে মনে হয় না।

নবীন বলল, "ঠিক আছে। তোমাদের কথাই থাকবে। কিন্তু আজ রাতের মতো যথেষ্ট হয়েছে। তোমাদের দাদু আর ঠাকুমা ভীষণ দুশ্চিন্তা করছেন। এবার তোমরা বাড়ি গিয়ে বিশ্রাম করো। কাল রাতে আবার আমরা সুড়ঙ্গে নামব।"

অনু সন্দিহান হয়ে বলল, "আমাদের ফাঁকি দিচ্ছ না তো?"

"না।"

"তা হলে কথা দাও।"

"দিচ্ছি।"

নবীন দুই ভাই-বোনকে তাদের বাড়ি অবধি পৌঁছে দিল। ফটকে বচন দাঁড়িয়ে ছিল। তাদের দেখে দৌড়ে এসে বলল, "এসেছ? বাঁচা গেল। বাবুকে বলেছি, তোমরা যাত্রা দেখছ। বাবু আর গিন্নিমা তবু ঘুমোননি। ওপরতলায় বসে আছেন। তোমাদের এ কী দশা?"

নবীন বলল, "সে অনেক কথা বচন, পরে শুনো। খুব জোর বিপদ থেকে বেঁচে ফিরেছি। ওদের আগে নিয়ে গিয়ে শুকনো জামাকাপড় পরিয়ে কিছু খাওয়াও। কর্তাবাবু যেন টের না পান। পরে আমি সব বুঝিয়ে বলব'খন তাঁকে।"

বচন মাথা নেড়ে বলল, "কোনও চিন্তা নেই।"

নবীন নিশ্চিন্ত হয়ে বাড়ি ফিরে এল।

নবীন বাড়ি ফিরে সোজা পাতালঘরে নেমে এল। সুড়ঙ্গের দরজাটা খুব আঁট করে বন্ধ করে দিল সে। তার পর অন্য দরজাটাও বন্ধ করে সে ওপরে উঠে এল। জামা-কাপড় পালটে হাত-মুখ ধুয়ে বিছানায় কম্বল-মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ল সে।

আচমকাই কানের কাছে একটা 'খুক' শব্দ। তার পর কানে-কানে সেই পরিচিত ফিসফিস আওয়াজ। "বাপের ব্যাটার মতো একটা কাজ করলে বটে হে। ওই চতুর্ভুজের মন্দিরে আমি এক সময়ে পুজুরি ছিলুম।"

নবীন একটু রেগে গিয়ে বলল, "মেলা ফ্যাচফ্যাচ করবেন না তো! আপনি কোথাকার পুজুরি ছিলেন, তা জেনে আমার লাভটা কী? বিপদের সময় তো আপনার টিকিটিরও নাগাল পাওয়া গেল না। জলে-ডোবা সুড়ঙ্গের মধ্যে আমরা যখন মরতে বসেছিলাম, তখন কোথায় ছিলেন? এখন যে ভারী আহ্লাদ দেখাতে এসেছেন!"

কণ্ঠস্বরটা একটু নিবু-নিবু হয়ে বলল, "সুড়ঙ্গের মধ্যে কি আর সাধে ঢুকিনি রে ভাই? তোমার ঊর্ধ্বতন ষষ্ঠপুরুষ কালীচরণকে দেখলে না? ইয়া গোঁফ, অ্যাই গালপাট্টা, ইয়া বুকের ছাতি, হাতির পায়ের মতো প্রকাণ্ড হাত, থামের মতো পা নিয়ে সুড়ঙ্গের মুখেই দাঁড়িয়ে ছিল।"

"কই, দেখিনি তো।"

"দ্যাখোনি যে ভালই করেছ, অশরীরী তো! তবে দেখলে মূর্ছা যেতে, তাকে দেখেই আমি মানে-মানে সরে পড়েছিলাম।"

"তাঁকে আপনার ভয় কী?"

"ও রে বাবা! সে অনেক কথা। চতুর্ভুজের মন্দির থেকে ওই কালীচরণই আমাকে তাড়িয়েছিল। দোষঘাট যে আমার ছিল না, তা নয়। চতুর্ভুজ স্বপ্নাদেশ দিয়েছিলেন, নরবলি দিতে হবে। কালীচরণকে বলেও ছিলাম সে-কথা। সে কানে তুলল না। বলল, 'তুমি আফিংয়ের ঘোরে কী সব আগড়ম-বাগড়ম দেখেছ, তাই বলেই কি তা মানতে হবে নাকি?' কিন্তু আমার ভয় হল স্বপ্নাদেশ না মানলে যদি মহা সর্বনাশ হয়ে যায়! তাই একটা গরিব বামুনের পাঁচ বছর বয়সের ছেলেকে চুরি করে আনি। পাতাল-মন্দিরের বাইরের কাকপক্ষীও টের পাবে না। কালীচরণও তখন ছিল না। কিন্তু কী বলব তোমায়, সেই পাঁচ বছরের ছেলের যে কী তেজ! এই হাত-পা ছিটকে বাঁধন প্রায় ছিঁড়ে ফেলে, কাছে গেলেই কামড়ে দিতে চায়। সে এক জ্বালাতন। শেষে অতিরিক্ত ছটফট করায় মাথা পাথরে টুকে রক্তপাত হল। খুঁত হলে তো আর বলি দেওয়া যায় না, সুতরাং দেরি হয়ে গেল। আর তা করতে গিয়ে কালীচরণ ফিরে এল। ওঃ কী মারটাই মেরেছিল আমায়! তিনটে দাঁত পড়ে গেল, একটা চোখ ফুলে ঢোল, হাড়গোড় আর আস্ত রাখেনি। ঘাড় ধরে বের করে দিল মন্দির থেকে। সেই থেকে গুন্ডাটাকে বড্ড ভয় খাই। তবে চতুর্ভুজের মন্দিরটার জন্য এখনও মনটা কেমন করে।"

নবীন বলল, "আপনি তো ভীষণ খারাপ লোক ছিলেন দেখছি।"

কুলদা চক্রবর্তীর ভূত ভারী দুঃখের সঙ্গে বলল, "সবাই বলত বটে কথাটা, আমি নাকি খারাপ লোক। এমনকী, আমার ব্রাহ্মণীও বলত, তুমি একটা পাষণ্ড। আমার বাবা বলত, তুই ব্রাহ্মণ-বংশের কুলাঙ্গার। কিন্তু মুশকিল কী জানো, আমি নিজে কিন্তু কখনও টের পাইনি যে, আমি খুব একটা খারাপ লোক। নিজেকে আমার বরাবর বেশ ভাল লোক বলেই মনে হত।"

"খারাপ লোকেরা নিজের খারাপটাকে যে দেখতে পায় না!"

“তাই হবে। কিন্তু আমি যদি তেমন খারাপ হতুম, তা হলে কি আর খোকা-খুকি দুটির বিপদের কথা জানিয়ে তোমাকে পথ দেখিয়ে জঙ্গলের মধ্যে ঠিক জায়গাটিতে নিয়ে যেতুম? ওরে বাবা, আমাকে লোকে যতটা খারাপ বলে জানে, আমি ততটা খারাপ নই।”

নবীন বলল, “এখনও আপনাকে আমার ভাল লোক বলে মনে হচ্ছে না।”

কুলদা চক্রবর্তীর ভূত ফোঁত করে একটা নাক-ঝাড়ার শব্দ করে বলল, “এখন যে এসেছি, সেও তোমার ভাল করার জন্যই।”

“তাই নাকি? কী রকম শুনি?”

“যে সব খুনে-গুণ্ডা তোমাদের সুড়ঙ্গের মধ্যে ধাওয়া করেছিল, তারা সব উঠে এসেছে। তোমার খোঁজে এল বলে। যদি প্রাণ বাঁচাতে চাও তো পালাও, অন্তত এ-ঘরটায় আজ রাতে আর শুয়ো না, তাদের অবশ্য ধারণা যে, তুমি ডোবা সুড়ঙ্গের জলে বাচ্চা দুটো-সহ ডুবে মরেছ। তবু তারা দেখতে আসছে, যদি কোনও রকমে বেঁচে গিয়ে থাকো তো নিকেশ করে যাবে।”

“ওরা কারা?”

“তা আমি জানি না বাপু! লোকের ধারণা, ভূত মানেই সর্বজ্ঞ। তাই কি হয় রে ভাই? সব জানলে ভূত থেকে কবে ভগবান হয়ে যেতুম।”

নবীন টের পেল, কুলদা চক্রবর্তীর ভূত গায়েব হয়ে গিয়েছে।

সে উঠে পড়ল। একটু দুশ্চিন্তা হচ্ছিল তার। বাড়িতে পিসি আর মহাদেব আছে। খুনেরা হয়তো তাদের কিছু করবে না। কিন্তু এত রাতে ঘুম থেকে তুলে তাদের অন্যত্র নিয়ে যাওয়াও প্রায় অসম্ভব। অনু আর বিলুর খোঁজ ওরা করবে কি না, তা সে বুঝতে পারছিল না। তবে মনে হয়, তাকে না পেলে ওরা ধরেই নেবে যে, তার সঙ্গে অনু আর বিলুও ডুবে মারা গেছে।

বিছানার চাদরটা টান-টান করে রাখল নবীন, যাতে বোঝা না যায় যে, বিছানায় কেউ শুয়েছিল।

তার পর নিঃশব্দে পাতালঘরের দিকে নেমে গেল নবীন।

দরজাটা এমনভাবে বন্ধ করেছিল, যাতে বাইরে থেকে খোলা যায়। ঘরে ঢুকে দরজাটা ফের বন্ধ করে দিয়ে নবীন ভাবতে বসল, এখন কী করা যায়? যারা পিছু নিয়েছিল, তারা যে চাঁপাকুঞ্জের সুড়ঙ্গ এবং ভিতরকার গুপ্তধনের কথা জানে, সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই। সশস্ত্র এবং নিষ্ঠুর প্রকৃতির এই লোকগুলোর বিরুদ্ধে নবীন কী করতে পারে?

নবীন কিছুক্ষণ ভাবল, এভাবে ইঁদুরের মতো গর্তে সেঁধিয়ে আত্মরক্ষা করা বেশিক্ষণ সম্ভব নয়। এভাবে বাঁচা যাবে না, বরং রহস্য উদঘাটনের চেষ্টাটাই বেশি নিরাপদ হবে।

নবীন জানে, খুনেরা যত বেপরোয়াই হোক, তারা এই শীতে জলে-ডোবা সুড়ঙ্গে কিছুতেই নামবার ঝুঁকি নেবে না। নবীনও নিত না। প্রাণের ভয়ে তারা ওই সাঙ্ঘাতিক কাজ করেছে। সুতরাং মন্দিরের সুড়ঙ্গ এখনও নিরাপদ।

নবীন সুড়ঙ্গের দরজা খুলে সরু সিঁড়ি ধরে নামতে লাগল। এ সবই তার পূর্বপুরুষেরা করে গেছেন। অনেক পরিশ্রম আর অনেক অর্থ ব্যয় করে তাঁরা তাঁদের ধনসম্পদ আর বিগ্রহকে রক্ষা করবার চেষ্টা করেছেন।

নবীন সিঁড়ির শেষে সরু গলিটা পেরিয়ে এসে ফের মন্দিরে ঢুকল। আর একটা দরজা এখনও দেখা হয়নি। ও দিকটায় কী আছে তা জানা দরকার।

নবীন মন্দিরের চতুর্থ দরজাটা দিয়ে আবার একটা গলিতে এসে দাঁড়াল। গলিটা ঢালু হয়ে খানিকটা নেমে গেছে। তার পর আবার ওপরে উঠেছে। তার পর খাড়া নেমে গেছে সোজা জলের মধ্যে।

ফের জল দেখে থমকে গেল নবীন। ভারী হতাশও হল। ফিরে যাওয়া ছাড়া আর উপায় নেই। রাস্তাটাকে ইচ্ছে করেই কি এত দুর্গম করা হয়েছিল? নাকি প্রকৃতির নিয়মে রাস্তা ধসে গিয়ে এই অবস্থা হয়েছে, তা চট করে বুঝে ওঠা মুশকিল। নবীন গলির দু' ধারের দেওয়াল ভাল করে পরীক্ষা করে দেখল, কোনও ফাটল বা গুপ্তপথ আছে কি না। নেই।

নবীন ফিরেই আসছিল। হঠাৎ জলে একটা ঝটপট শব্দ হওয়ায় ফিরে দেখল, মস্ত একটা কাতলা মাছ অল্প জলে খেলা করছে। টর্চের আলো দেখে ফিরে চলে গেল।

কেমন যেন মনে হল নবীনের, মাছটার এই হঠাৎ আসা আর যাওয়ার মধ্যে কোনও একটা ইঙ্গিত আছে। তাকে কি জলে নামতেই বলছে কেউ?

প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় একবার জলে ভিজে কষ্ট পেতে হয়েছে। আবার ভিজলে নিঘাত নিউমোনিয়া। কিন্তু উপায়ই বা কী? জলের তলায় কী আছে না আছে, তা না জানলে এই জট খোলা যাবে?

নবীন তার গায়ের চাদর খুলে ফেলল। জুতো ছাড়ল, কী ভেবে টর্চটাও রেখে দিল। তার পর ধীরে-ধীরে বরফের মতো ঠাণ্ডা জলে নেমে গেল।

ডুব না দিয়ে উপায় নেই। এখানেও সুড়ঙ্গটা সোজা জলে নেমে গেছে। কোথায় উঠেছে, কে জানে?

নবীন বুকভরে দম নিয়ে জলে ডুব দিল। তার পর প্রাণপণে সাঁতার দিতে লাগল।

এবার আর বেশি দূর যেতে হল না। হাত-দশেকও নয়, নবীন মাথা তুলতেই দেখল, মাথার ওপর ফাঁকা, দম নেওয়া যাচ্ছে।

নবীন ফিকে অন্ধকারে চার দিকে চেয়ে যা দেখল, তাতে তার চোখ স্থির। সে বড় ঝিলের মাঝ-বরাবর জলে ভাসছে। তিন দিকে বিশাল ঝিল আর জঙ্গল, একধারে ঝিলের ধারের বাড়িটা ভুতুড়ে বাড়ির মতো দাঁড়িয়ে আছে কুয়াশা-মাখা আবছা অন্ধকারে।

হঠাৎ বিদ্যুচ্চমকের মতো নবীনের মনে পড়ে গেল, ওই বাড়িতে কবে যেন ভাড়াটে এসেছে বলে বলছিল সিদ্ধিনাথ? নতুন ভাড়াটে? তারা কারা?

নবীন নিঃশব্দে দ্রুত গতিতে ঘাটের দিকে এগিয়ে গেল। তার পর সাবধানে সিঁড়ি বেয়ে উঠে এল পৈঠায়।

একটা ঝোপের আড়ালে দাঁড়িয়ে গায়ের জামা-টামা খুলে যতদূর সম্ভব নিংড়ে নিল সে। গা-হাত-পা মুছে নিল নিজের ভেজা জামা-কাপড় দিয়েই। তার পর বাগানের গাছপালার আড়াল দিয়ে এগোতে লাগল বাড়িটার দিকে।

পুরনো ঝুরঝুরে বাড়ি। অন্ধকার, জনমনিষ্যি কেউ আছে বলে মনে হল না নবীনের।

সে পিছনের বারান্দায় উঠে সাবধানে দরজাগুলো একে-একে টেনে দেখল। সবই ভিতর থেকে বন্ধ। রাস্তার দিকে বাড়ির সদর। নবীন বাড়িটা ঘুরে সামনে চলে এল। একটা ঝোপের আড়াল থেকে লক্ষ করে দেখল। কেউ আছে বলে মনে হল না। ভাড়াটেরা হয় বেরিয়ে গেছে, নয়তো ঘুমোচ্ছ। বাইরে কোনও পাহারা নেই।

নবীন ঝোপের আড়াল থেকে উঠে এক-পা এগোল, পিছনে সামান্য মড়মড় শব্দ...নবীন ফিরে তাকাতে যাচ্ছিল...হঠাৎ তার ঘাড়ে ভালুকের মতো কে যেন লাফিয়ে পড়ল।

প্রথম ধাক্কাতেই হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল নবীন।

দুটো লোহার মতো হাত তার ঘাড়টা শক্ত করে ধরে মুখটাকে ঠেসে রইল মাটিতে। নবীন দম নিতে পারছে না। প্রবল চাপে তার চোখ ফেটে জল এল।

ধীরে-ধীরে সাঁড়াশির মতো দুটো হাত আরও চেপে বসল ঘাড়ে। একটা হাঁটু চেপে রেখেছে তার কোমর।

নবীনের গায়ে যে জোর কম, তা নয়—তবে আচমকা এই আক্রমণে সে বড় বেকায়দায় পড়ে গেছে।

কানের কাছে আবার সেই 'খুক' শব্দ। একটা কণ্ঠস্বর ফিসফিস করে বলল, "ভাল খবর আছে হে। একটু আগে চাঁপাকুঞ্জের শ্মশানে কালীচরণের সঙ্গে দেখা, বুঝলে? দেখেই তো আমি তাড়াতাড়ি সটকে পড়ছিলাম। তা হঠাৎ হল কী, জানো? কালীচরণ এই দেড়শো কি পৌনে দু'শো বছর পর হঠাৎ আমার সঙ্গে কথা কইল। কী কইল জানো? কইল, 'ওহে চখোত্তি, ওই নবীন ছোঁড়াটা একটু পাগলা বটে, কিন্তু আমার বংশের শিবরাত্তিরের সলতে, মনে হচ্ছে, বিপদে পড়বে, ওকে একটু দেখো।'"

নবীনের ইচ্ছে হচ্ছিল, কুলদা চক্কোত্তির টিকিটা ধরে আচ্ছাসে নেড়ে দেয়। নবীনের শ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে, আর খিটকেলে ভূতটা বকবক করে যাচ্ছে।

কুলদা চক্রবর্তীর অবশ্য কোনও বৈলক্ষণ নেই। ফিসফিস করে বলল, "বুঝলে, এই এত বছর বাদে কালীচরণের রাগ কিছু পড়েছে বলেই মনে হয়! যদি ভগবান মুখ তুলে চান, তবে চাই কি, ফের পুরুতগিরিতে বহালও করতে পারে। তা সে-কথা যাক গে, এই গুণ্ডাটা দেখছি তোমাকে বেশ পেড়ে ফেলেছে...ইঃ, তোমার যে একেবারে ল্যাজে-গোবরে অবস্থা! তা একটা কাজ করো, বাঁ পা-টা ভাঁজ করে ওপরে তুলে ঘোড়া যেমন চাঁট মারে, তেমনি একখানা ঝাড়ো তো বাপু?"

নবীনের জ্ঞান ধীরে-ধীরে লুপ্ত হয়ে যাচ্ছিল। তবু এ-কথাটা সে শুনল। বাঁ পা-টা তুলে চড়াক্ করে একখানা গোড়ালির গুঁতো বসিয়ে দিতে পারল লোকটার পিঠে। উপুড় হয়ে পড়ে থেকে এর বেশি আর সম্ভবও নয়।

লাথিটা কষাতেই ঘাড়ের চাপটা অর্ধেক কমে গেল হঠাৎ। আর সেই সুযোগে নবীন একটা ঝটকা মেরে পিঠের ওপর থেকে লোকটাকে ছিটকে ফেলে মাটিতে একপাক গড়িয়ে গেল।

তার পর সে বাঘের মতো লাফিয়ে পড়ল লোকটার ওপর। এরাই না তাদের তিনজনকে কুয়োর মধ্যে খুন করতে চেয়েছিল? এরাই না বোমা ছুঁড়ে মেরেছিল? দুটি শিশুকেও এই পাষণ্ডরা মায়া করেনি।

নবীনের গোটা পাঁচ-ছয় ঘুসি খেয়ে লোকটা মাটিতে পড়ে গেল। নড়ল না।

নবীন উপুড় হয়ে লোকটাকে পরীক্ষা করে দেখল। কোমরের বেল্ট থেকে একটা টর্চ জ্বলছিল, সেটা খুলে নিয়ে নবীন লোকটার মুখে আলো ফেলল। অচেনা মুখ। তবে লোকটা যে শহরের, তাতে সন্দেহ নেই। পকেট-টকেটও হাতড়ে দেখল নবীন। না, কোনও অস্ত্র নেই। এমনকী, একটা লাঠিও না।

নবীন ধীর পায়ে বাড়ির বারান্দায় উঠল। একটা, দরজা টানতেই খুলে গেল ক্যাঁচ-কোঁচ শব্দ করে।

ভিতরে ঢুকে চার দিকে আলো ফেলল নবীন। সামনের বড় ঘরটায় কয়েকটা বাক্স-প্যাঁটরা রয়েছে। এখনও খোলা হয়নি।

পরের ঘরটায় একটা পোর্টেবল র‍্যাকের ওপর দুটো মাইক্রোস্কোপ আর অনেকগুলো জার রয়েছে। কয়েকটা জাল-লাগানো কাঠের বাক্সও।

নবীন এ-ঘরটা পার হয়ে পরের ঘরটায় ঢুকতে গিয়ে ভিতরে অদ্ভুত একটা শব্দ শুনে সভয়ে দাঁড়িয়ে গেল। মনে হচ্ছে, কোনও বিচিত্র হিংস্র প্রাণীর আওয়াজ।

একটু বাদেই তার ভুল ভাঙল। কোনও হিংস্র প্রাণী নয়, দুটো ক্যাম্প-খাটের ওপর দু'জন লোক অঘোরে ঘুমোচ্ছ আর তাদের নাক ওই-রকম ভয়ঙ্করভাবে ডাকছে।

নবীন দু'জনের মুখেই টর্চের আলো ফেলল। শহরের লোক, ঘুমন্ত মুখ দেখে কিছু বোঝবারও উপায় নেই, এরা কেমন লোক। তবে এদের একজনকে সে চেনে। অভিজিৎ। সদাশিববাবু আলাপ করিয়ে দিয়েছিলেন। এই লোকটাই ঘুরঘুর করছিল তার বাড়ির বাগানে।

হঠাৎ লোকটার নাকের আওয়াজ থেমে গেল। লোকটা চোখ মেলে তড়াক করে উঠে বসে বলল, "কে?"

নবীন টর্চটা নিভিয়ে দিয়ে বলল, "ভয় নেই। আমার নাম নবীন।"

"ওঃ নবীনবাবু! এত রাতে কী ব্যাপার?"

"আমি জানতে চাই, আপনারা কারা?"

অভিজিৎ একটু বিরক্ত গলায় বলল, "এত রাতে ঘুম ভাঙিয়ে এটা কী ধরনের রসিকতা?"

"রসিকতা নয়। পরিচয় জিজ্ঞেস করার গুরুতর কারণ আছে। গত কয়েক ঘন্টা যাবৎ কয়েকজন খুনে লোক বন্দুক-পিস্তল নিয়ে আমাকে তাড়া করছে। তারা আমাকে খুন করতে চায়। কিন্তু কেন চায় এবং তারা কারা, তা আমার জানা দরকার।"

অভিজিৎ একটু বিগলিত গলায় বলল, "তারা কারা, তা আমিই বা কী করে বলব? আপনার কি সন্দেহ যে, আমরাই আপনাকে খুন করার চেষ্টা করছিলাম?"

"কেটেরহাটে এমন কোনও লোককে আমি জানি না, যার কাছে বন্দুক-পিস্তল বা বোমা আছে।"

"কেন, সদাশিববাবুরই তো আছে।"

"তা আছে। তবে তাঁর বয়স আশির কাছাকাছি।"

অভিজিৎ উঠে একটা লণ্ঠন জ্বালল। তার পর নবীনের দিকে চেয়ে বলল, "আরে, আপনি যে শীতে কাঁপছেন! সর্বাঙ্গ ভেজা!"

"হ্যাঁ, আমি ঝিল থেকে একটু আগেই উঠে এসেছি।"

"আপনি কি পাগল? এই প্রচণ্ড শীতে ঝিলে নেমেছিলেন কেন?"

"সে-কথা পরে। আপনাদের মতলব কী বলুন তো? আপনারা আসার পরেই কেন এ সব ঘটনা ঘটছে? সিদ্ধিনাথকে আপনারা তাড়াতে চেয়েছিলেন, না-পেরে তাকে মেরে যমের দক্ষিণ দোরে পৌঁছে দিয়েছেন। ভুজঙ্গের মাথা ফাটিয়েছেন, সদাশিবের দুটো ফুলের মতো নাতি-নাতনি আর আমাকে গুলি করে মারতে চেয়েছেন।"

অভিজিৎ এ সব কথার কোনও জবাব দিল না। বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "আমাদের কাছে বন্দুক একটা আছে বটে, কিন্তু সেটা ডাকাতের ভয়ে রাখতে হয়েছে। যদি বিশ্বাস না হয়, তবে নিজেই খুঁজে দেখতে পারেন। আমরা পোকা-মাকড় নিয়ে রিসার্চ করতে এসেছি। অন্য কোনও

উদ্দেশ্য নেই। সিদ্ধিনাথ বা ভুজঙ্গকে কে মেরেছে, তাও আমরা জানি না। তবে গতকাল বিকেলে আমরা বেড়াতে বেরিয়েছিলাম। ফিরে এসে দেখি, সদর দরজায় কে আঠা দিয়ে একটা কাগজ সেঁটে রেখে গেছে। আমরা কাগজটা খুলে রেখেছি। আপনিও দেখতে পারেন।"

এই বলে অভিজিৎ টেবিল থেকে একটা কাগজ তুলে নবীনের হাতে দিল। নবীন দেখল, তাতে লেখা: চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে এ-জায়গা ছেড়ে চলে না গেলে মরতে হবে।

নবীন কাগজটা অভিজিতের হাতে ফিরিয়ে দিয়ে বলল, "আপনাদের একজন একটু আগে বাগানে আমাকে আক্রমণ করেছিল। আপনারা যদি ভাল লোকই হবেন, তা হলে গুণ্ডা পুষেছেন কেন? যে আমাকে প্রায় মেরেই ফেলেছিল!"

অভিজিৎ একটু হেসে বলল, "আমাদের কাছে কিছু দামি যন্ত্রপাতি আছে। এ-জায়গাটা কেমন, তা তো জানি না। তাই আমরা পালা করে সারা রাত পাহারা দিই। সুহাস একটু মারকুটে বটে, কিন্তু খুনি নয়। আর আপনার সঙ্গে সে তো বিশেষ সুবিধেও করতে পারেনি দেখছি। তাকে কী অবস্থায় রেখে এসেছেন? মানুষটা আস্ত আছে তো?"

নবীন নিজের ঘাড়ে একটু হাত বুলিয়ে বলল, "আছে। শ্বাস পড়ছে, দেখে এসেছি। তবে জ্ঞান নেই।"

"তা হলে তার একটা ব্যবস্থা এখনই করতে হয়। বাগানে এভাবে পড়ে থাকলে ঠাণ্ডায় মরে যাবে।"

"চলুন, আমিও আপনাকে সাহায্য করছি।"

দু'জনে ধরাধরি করে সুহাসকে বাগান থেকে ঘরে নিয়ে এল। অভিজিৎ তার চোখে জলের ঝাপটা দিতেই সে চোখ মেলে উঠে বসল। আর এই সব গণ্ডগোলে সুদর্শনও ঘুম ভেঙে উঠে পড়েছে।

অভিজিং করুণাভরে বলল, "আমাদের কাছে কিছু একসট্রা জামা-কাপড় আছে। আপনি পরতে পারেন। সুহাস আর আপনার ফিগার একই রকম।"

নবীন শীতে কাঁপতে কাপতে রাজি হয়ে পোশাক পরে নিল। চমৎকার নরম উলের তৈরি প্যান্ট আর নাইলনের জামার ওপর একটা গলাবন্ধ পুল-ওভার।

একটা স্টোভ জ্বেলে অভিজিৎ কফিও বানিয়ে ফেলল কয়েক মিনিটে। নবীনের অভ্যেস নেই। তবু গরম কফি খেয়ে শরীরটা বেশ তেতে উঠল তার।

অভিজিৎ বলল, "এবার বলুন, কী করতে চান?"

নবীন মাথা নেড়ে বলল, "বুঝতে পারছি না।"

"কিছু বদমাশ আপনার পেছনে লেগেছে। তাদের টিট করতে হবে, এই তো?"

নবীন মাথা নেড়ে বলল, "তা-ই। টিট না করলে তারা আমাকে যমের বাড়ি পাঠাবে।"

"সেটাই স্বাভাবিক। আগেই বলে রাখছি, আমরা এ সব কাজে অভ্যস্ত নই। আমরা বিজ্ঞানী। কিন্তু তবু আপনাকে সাহায্য করতে রাজি আছি।"

নবীন একটু ভাবল। এরা সত্যিই কেমন লোক, তা সে জানে না। এরা যদি তারা নাও হয়ে থাকে, তাতেও কিছু যায়-আসে না। কিন্তু এরাও যদি খারাপ লোক হয়ে থাকে, তখন কী হবে?

তাই সে বলল, "আপনারা আমাদের অতিথি। আপনাদের বিপদে ফেলাটা কি ঠিক হবে?"

অভিজিৎ মৃদু হেসে বলল, “বিপদে আমাদের মাঝে-মাঝেই পড়তে হয়। মাঠঘাট-জঙ্গলে কাজ করলে বিপদ ঘটবেই। আর-একটা কথাও আছে, এ-লোকগুলো আজ আপনার পিছনে লেগেছে। কাল আমাদের পিছনেও লাগতে পারে। চলুন। আর দেরি করা ঠিক হবে না।”

অনু আর বিলু বাড়ি ফিরে এসে গরম জলে হাত-মুখ ধুয়ে জামা-কাপড় পালটে এবং দুধ খেয়ে শুয়ে পড়েছিল। কিন্তু এত সব ঘটনার ফলে তাদের মাথা এত গরম হয়ে গেছে যে, কিছুতেই ঘুম এল না।

অনু ডাকল, “বিলু! ঘুমোলি?”

“না রে, দিদি।”

“আমার কী মনে হচ্ছে জানিস? নবীনদা আমাদের ফাঁকি দিয়ে ফের গুহায় নেমেছে।”

“তা হলে চল, যাবি?”

“যাব। ওঠ।”

দুই ভাই-বোন উঠে চটপট পোশাক পরে নিল। বাড়ি নিঃঝুম। কেউ জেগে নেই। কাজেই সকলের অজান্তে বেরিয়ে পড়তে তাদের কোনও অসুবিধেই হবে না।

কিন্তু বেরোবার মুখেই হঠাৎ পথ আটকে সদাশিব এসে দাঁড়ালেন, “কোথায় যাচ্ছিস?”

ছ’জন লোক যখন নিঃশব্দে নবীনের বাড়ি ঢুকল, তখন রাত আরও গাঢ় হয়েছে। চার দিক ভীষণ নিস্তব্ধ।

ছ’জন লোকের হাতেই বন্দুক পিস্তল ইত্যাদি। সর্দার গোছের লোকটা একটু চাপা গলায় বলল, “দাঁড়িয়ে পড়। পালাতে না পারে।”

চোখের পলকে ছ’জন দু’দিকে ছিটকে ছড়িয়ে পড়ল।

সর্দারের হাতে একটা পিস্তল। নবীনের বাড়ির সদর দরজাটা সে একটা তারের সাহায্যে মাত্র কয়েক সেকেন্ডে বাইরে থেকে খুলে ফেলল। তার পর ঢুকল নবীনের শোবার ঘরে।

তার পর টর্চ জ্বালল।

বিছানায় নবীন গভীর ঘুমে অচেতন। সদার একটু তৃপ্তির হাসি হাসল। ছোট্ট করে মৃদু একটা শিস দিল সে। বাইরে থেকে তার আর দু’জন স্যাঙাত ছায়ায় মতো পাশে এসে দাঁড়াল।

সর্দার নবীনকে দেখিয়ে চাপা গলায় বলল, “জলে ডুবে মরেনি। তার মানে সুড়ঙ্গে জলের তলা দিয়ে রাস্তা আছে। আর সে-রাস্তা এ-বাড়িতে এসে উঠেছে। পাতালঘরে ঢোকার সন্ধান তা হলে পাওয়া গেছে। ওকে তোল।”

একজন গিয়ে নবীনের গা থেকে কম্বলটা ঝটকা মেরে সরিয়ে তার চুল টেনে তুলল।

নবীন আতঙ্কের গলায় বলল, “কী ব্যাপার? তোমরা কে?”

“কথায় কথা বাড়ে নবীনবাবু। আমাদের পাতালঘরে নিয়ে চলো। সময় বেশি নেই।”

“পাতালঘর?”

সর্দার মৃদু হেসে বলল, “সোজা আঙুলে ঘি উঠবে না, আমি জানি। বলে সর্দার তার অস্ত্রটা উলটে নিয়ে নবীনের হাতটা টেনে ধরে বলল, “পিস্তলের বাঁট দিয়ে তোমার কব্‌জিটা ভেঙে দেব নবীনবাবু?”

ঠিক এই সময়ে সর্দারের ডান চোয়ালে একটা ঘুসি এসে পড়ল। আর, দু'জন লোক লাফিয়ে পড়ল আর-দুজনের ঘাড়ে। নবীন বিছানা থেকে লাফ দিয়ে নেমে সর্দারকে একটা ল্যাং মেরে ফেলে দিল।

প্রথম লড়াইটা নবীনরা এক রকম জিতেই গিয়েছিল। তিনজনই কুমড়ো-গড়াগড়ি। সংখ্যাতেও নবীনরা চারজন।

কিন্তু সর্দার পড়ে গিয়েও একটা টানা লম্বা শিস দিল।

লড়াইয়ের মাঝখানেই আরও তিনজন লোক পিস্তল হাতে ঘরে এসে ঢুকল।

অভিজিৎ হাঁফানো গলায় বলল, "নবীনবাবু, সারেন্ডার করে দিন। নইলে সবাই মরব।"

নবীনও বুঝল, লড়ে লাভ নেই। সদার উঠে পিস্তলটা কুড়িয়ে নিয়ে বলল, "এবার চলো নবীনবাবু। পাতালঘরের দরজাটা খোলো। ওরে, এই তিনজন মর্কটকে অজ্ঞান করে রেখে যা।"

তিনটে পিস্তলের বাঁটের ঘায়ে অভিজিৎ, সুহাস আর সুদর্শন লুটিয়ে পড়ে গেল মেঝেয়। দু'জন ডাকাত তাদের পাহারা দিতে লাগল। চারজন নবীনকে নিয়ে পাতালঘরে নামল। নবীন দরজা খুলল। তাকে সামনে নিয়ে ঘরে ঢুকল চারজন।

সর্দার এগিয়ে গিয়ে জালার মুখগুলো খুলে ফেলল। তার পর বলল, "বাঃ। নবীনবাবু তো এখন বেশ বড়লোক দেখছি। অবশ্য এ সব ভোগ করা আর নবীনবাবুর কপালে হয়ে উঠবে না। ওরে কালু, সুড়ঙ্গে নিয়ে গিয়ে নবীনবাবুর ব্যবস্থা কর, যাতে আর কখনও মুখ দিয়ে শব্দ বার না হয়।"

দুটো পিস্তলের নল এগিয়ে এসে ঠেকল নবীনের বুকে।

"চলো।"

নবীনের মাথায় হঠাৎ আগুন জ্বলে গেল। অনেকক্ষণ ধরে সে সহ্য করছে। আর পারল না। বাঘের মতো একটা গর্জন ছেড়ে সে একজনের ওপর লাফিয়ে পড়ল। তার পর একটা খুব ঝটাপটি হতে লাগল। তার ওপর আরও দু'জন এসে পড়ল। নবীন দু' হাত এবং দু' পা সমান তেজে চালিয়ে যেতে লাগল। কে যেন কানের কাছে ফিসফিস করে বলে যেতে থাকল, "চালাও, চালাও স্বয়ং কালীচরণ কর্তা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তোমার এলেম দেখছেন যে! খুশিও হচ্ছেন খুব। গোঁফে তা দিচ্ছেন আর হাসছেন।"

নবীনের গায়ে যেন বুনো জোর এল। সে প্রাণপণে লড়ে যেতে লাগল অন্ধকারে। তার মধ্যে দু' বার দুটো পিস্তলের আওয়াজ হল।

তার পরই হঠাৎ একটা মস্ত টর্চ বাতির আলো এসে পড়ল ঘরে। দরজার কাছ থেকে সদাশিববাবুর গলা পাওয়া গেল, "খবরদার! সব স্থির হয়ে দাঁড়াও। নইলে সব কটাকে পুঁতে ফেলব।"

সদাশিব একা নন। সঙ্গে বচন, লেঠেল, রহিম শেখ, অনু, বিলু, আর অভিজিৎ। সদাশিবের হাতে বন্দুক।

চারজন ডাকাতের হাত থেকেই পিস্তল খসে পড়েছিল মারামারি করতে গিয়ে। সর্দার তার পিস্তলটার জন্য ঝাঁপ খেল বটে, কিন্তু রহিম শেখ বিদ্যুতের মত লাঠিটা চালাতেই সর্দার চিৎপাত হয়ে পড়ে গেল। ওপরে পাহারাদার দুই ডাকাতকে ঠিক এ রকম ভাবেই ঘায়েল করে এসেছে সে এই মাত্র।

মাঝরাতে গোপীনাথের পেটে কে যে কাতুকুতু দিল, কে জানে। গোপীনাথের ভারী কাতুকুতু। সে ঘুমের মধ্যেই খুব খিলখিল করে হাসতে-হাসতে উঠে বসল। কার এমন সাহস?

“কার এত বুকের পাটা যে, আমায় কাতুকুতু দিল!”

“আজ্ঞে, আমার। আমি নবীন। একটু আগে পাতালঘরে খুন হয়েছি। আমি নবীনের ভূত।”

“ওরে বাবা রে।”

“নরক জায়গাটা ভীষণ খারাপ, গোপীনাথবাবু। যা ভেবেছিলাম, তার চেয়েও খারাপ। যে যমদূতেরা আমাকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে, তারা বলছে যে, সেখানে নাকি সারা গায়ে ছুঁচ ফুটিয়ে মানুষকে পিন-কুশন বানিয়ে রাখা হয়। চোখের মধ্যে গরম সিসে ঢেলে দেয়...”

“বাবা গো!”

“আপনাকেও নরকেই যেতে হবে। বেশি দিন নেই। আপনার লোকেরা আমাকে খুন করেছে ঠিকই, কিন্তু তারা আপনাকে একটি মোহরও দেবে না। সব নিজেদের মধ্যে ভাগ-বাঁটোয়ারা করে নিচ্ছে দেখুন গে।”

“বটে! নিধিরামের এত সাহস! আমি ব'লে তাকে ভাল জেনে হাতরাশগড় থেকে আনালুম, আর তারই এই কীর্তি! দাঁড়াও, দেখাচ্ছি...”

গোপীনাথ উঠতে যাচ্ছিল। হঠাৎ মনে হল, ঘরে আরও লোক ঢুকেছে। গোপীনাথ আলোটা বাড়িয়ে তাকাল।

সামনেই দারোগা। পিছনে আরও অনেক লোক।

গোপীনাথ বলল, “ওরে বাবা।”

উপসংহার

গোপীনাথকে পুলিশে ধরে নিয়ে গেছে। তার ভাড়াটে গুণ্ডাদেরও।

নবীন যেসব সোনা-দানা পাতালঘর থেকে পেল, তার একটাও সে নিজে নিল না। শুধু বাড়ির বাবদে গোপীনাথের কাছে যে দেনা ছিল, সেটা শোধ করে দিল গোপীনাথের ছেলেকে। বাকি সোনা-দানা বেচে যে কয়েক লাখ টাকা পেল, তা দান করে দিল গরিব-দুঃখীদের। বলল, "আমার পূর্বপুরুষেরা অন্যেরটা লুঠ করে এনেছিলেন। আমি তাই অন্যকেই দান করে দিলাম।"

সদাশিববাবু শুনে বললেন, "হুঁ! নবীন ছোকরা খারাপ নয় জানি। তা বলে কালীনাথ সুবিধের লোক ছিল না। তার চেয়ে আমার ঊর্ধ্বতন পঞ্চম পুরুষ..."

শুনে অনু আর বিলু হেসে খুন।